প্রত্যাশা

একটি মানব উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

- **বিস্ময়কর গ্রন্থ আল কুরআন**
  গ্যারী মিলার
- **আহলে সুন্নাতের বর্ণিত হাদীস ও মনীষীদের দৃষ্টিতে ইমাম মাহ্‌দী (আ.)**
- **নীতি-নৈতিকতা সম্পর্কিত কতিপয় বিষয়**
- **ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর আবির্ভাব কালে বিশ্বের সার্বিক চিত্র**
  আল্লামা আলী আল কুরানী
- **আপনার জিজ্ঞাসা**
- **প্লেটোনিক ধারণা প্রসঙ্গে সাদরুল মোতাআল্লেহীন**
  যাহ্‌রা মোস্তাফাভী
- **ইসলামী সন্ত্রাসবাদ : বাস্তবতা না কি কল্পকথা**
  ডক্টর এনায়েতুল্লাহ্‌ ইয়াযদানি ও হুজরাত ইয়াযদি

বর্ষ ২, সংখ্যা ২, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১১

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু
আল্লাহ্‌র নামে

প্রত্যাশা

একটি মানব উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

বর্ষ ২, সংখ্যা ২

জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১১

সম্পাদক	:	**এ.কে.এম. আনোয়ারুল কবীর**
সহযোগী সম্পাদক	:	**ড. জহির উদ্দিন মাহমুদ**
নির্বাহী সম্পাদক	:	**মো. আশিফুর রহমান**
উপদেষ্টামণ্ডলী	:	মোহাম্মদ মুনীর হুসাইন খান
		আব্দুল কুদ্দুস বাদশা
		এস.এম. আশেক ইয়ামিন
প্রকাশক	:	মো. আশিকুর রহমান
প্রকাশকাল	:	আষাঢ়-আশ্বিন ১৪১৮
		রজব-শাওয়াল ১৪৩২ হি.
		জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১১ ইং
মূল্য	:	৫০ (পঞ্চাশ) টাকা
যোগাযোগের ঠিকানা	:	দোকান নং ৩৩৬ (৩য় তলা, দক্ষিণ পার্শ্ব), মুক্তবাংলা
(পরিবর্তিত ঠিকানা)		শপিং কমপ্লেক্স, মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬
ই-মেইল	:	prottasha.2010@yahoo.com

Prottasha (Vol. 2, No. 2, July-September, 2011), Editor: A.K.M. Anwarul Kabir; Associate Editor: Dr. Zahiruddin Mahmud; Executive Editor: Md. Asifur Rahman; Advisors: Mohammad Munir Hossain Khan, Mohammad Abdul Quddus Badsha, S.M. Asheque Yamin; Publisher: Md. Ashiqur Rahman; Address: 336 (2nd fl. Right Side), Muktobangla Shopping Complex, Mirpur-1, Dhaka-1216; E-mail: prottasha.2010@yahoo.com

সূচীপত্র

- **সম্পাদকীয়**

  ইসলাম এবং বিশ্বজনীন শান্তি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ৭

- **ধর্মতত্ত্ব**

  বিস্ময়কর গ্রন্থ আল কুরআন ১১

  গ্যারী মিলার

  আহলে সুন্নাতের হাদীস ও মনীষীদের দৃষ্টিতে ইমাম মাহ্দী (আ.) ২১

- **নীতি-বিজ্ঞান**

  নীতি-নৈতিকতা সম্পর্কিত কতিপয় বিষয় ৩৩

  সংকলন : মো. আশিফুর রহমান

- **বিশেষ নিবন্ধ**

  ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর আবির্ভাব কালে বিশ্বের সার্বিক চিত্র ৬১

  আল্লামা আলী আল কুরানী

- **আপনার জিজ্ঞাসা**

  রাজনীতি কি ধর্ম থেকে পৃথক ৭৭

- **দর্শন ও বিজ্ঞান**

  প্লেটোনিক ধারণা প্রসঙ্গে সাদরুল মোতাআল্লেহীন ৮৫

  যাহ্রা মোস্তাফাভী

- **সমকালীন বিশ্ব**

  ইসলামী সন্ত্রাসবাদ : বাস্তবতা না কি কল্পকথা ১১৩

  ডক্টর এনায়েতুল্লাহ্ ইয়াযদানি ও হুজরাত ইয়াযদি

Prottasha

A Quarterly Journal of Human Development
Vol. 2, No. 2, July-September, 2011

Table of Contents

- **Editorial**

  Islam and the Dream of Establishing Universal Peace and Jutice 7

- **Theology**

  The Amazing Quran 11

  Gary Miller

  Imam Mahdi (A.) In The Hadith (Tradition) of Ahl-al-Sunnah and the View of their Scholars 21

- **Ethics**

  Some Issues Related to Ethics and Morality 33

  Compilation : Md. Asifur Rahman

- **Special Article**

  Overall Situation of the World During the Arrival of Imam Mahdi (A.) 61

  Ali Al Qurani

- **Your Questions**

  Is Politics Seperated from the Religion 77

- **Philosophy and Science**

  Sadr-ol-Mota'allahin on Platonic Ideas 85

  Zahra Mostafavi

- **Contemporary World**

  Islamic Terrorism : Fact or Myth 113

  Dr. Enayetullah Yazdani and Huzrat Yazdi

গ্রাহক চাঁদার হার		
ডাকযোগে (পোস্টাল চার্জ সহ)	৬০ টাকা (প্রতি কপি)	২৪০ টাকা (বাৎসরিক)

ডাকযোগে পত্রিকা পেতে গ্রাহক চাঁদা মানি অর্ডার করে নিচের ঠিকানায় প্রেরণ করতে হবে :

মো. আশিফুর রহমান
বাড়ি নং-৪ (পশ্চিম পাশ, নিচতলা), রোড নং-৩, ব্লক- সি, সেকশন-২, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

সম্পাদকীয়

ইসলাম এবং বিশ্বজনীন শান্তি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন

সম্পাদকীয়

ইসলাম এবং বিশ্বজনীন শান্তি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন

বিশ্বব্যাপী শান্তি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন মানব জাতি সমাজবদ্ধ জীবনের শুরু থেকেই লালন করে এসেছে। ঐতিহাসিক পর্যালোচনা এবং ধর্মগ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন থেকে এ বিষয়টির সত্যতা নির্ণয় করা যায়। প্রাচীন দার্শনিকদের মধ্যে যেমন এ বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব দানের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, তেমনি আধুনিক সমাজেও শান্তি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা বিশেষভাবে পরিদৃষ্ট হয়। তবে পূর্বে যেমন এরূপ মূল্যবোধ কেবল দার্শনিকরাই পোষণ করতেন, বর্তমানে তা অনেকটা সর্বজনীনতা লাভ করেছে এবং দার্শনিক ও চিন্তাবিদদের পরিমণ্ডল পেরিয়ে সাধারণের পর্যায়ে পৌঁছেছে। শান্তিপূর্ণ ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার বিষয়টি মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি থেকে উৎসারিত। এ কারণেই পবিত্র কুরআন হযরত আদম (আ.) থেকে সর্বশেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মাদ (সা.) পর্যন্ত সকল নবী প্রেরণের উদ্দেশ্য যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা সে কথা বলেছে। এ ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব শুধু নবীদেরই নয়; বরং সকল মানুষের : 'নিশ্চয়ই আমরা আমাদের রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছি স্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাদের সাথে দিয়েছি কিতাব (ঐশী গ্রন্থ) ও ন্যায়নীতি (মানদণ্ড) যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে।' (সূরা হাদীদ : ২৫)।

কিন্তু মানব-সমাজে সকল সময় একদল লোক ছিল যারা এ শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার পথে প্রতিবন্ধক ছিল। মানব ইতিহাসে কখনও একক ব্যক্তি, কখনও এক বংশ বা গোত্র, কখনও এক দল ও গোষ্ঠী, আবার কখনও এক রাষ্ট্র বা কয়েকটি রাষ্ট্র সমগ্র মানব জাতির শান্তিকে বিঘ্নিত করেছে এবং শোষণ ও বঞ্চনার মাধ্যমে অন্যদের ওপর জুলুম ও অবিচার চাপিয়ে দিয়েছে। সার্বিক দৃষ্টিতে চিন্তা করলে এরূপ ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও শাসকরাই ইতিহাসের সকল পর্যায়ে মানব জাতির চালিকাশক্তির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং মানব জাতিকে তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে।

কিন্তু প্রশ্ন হল এ অবস্থা কি পৃথিবীর প্রলয় দিবস পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে এবং মানব জাতি কি কখনই তার কাঙ্ক্ষিত বিষয় অর্জনে সক্ষম হবে না? তারা কি কখনই এমন শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হবে না যেখানে কোনরূপ অন্যায়-অবিচার থাকবে না? এ বিষয়টি নির্ভর করে মানব সমাজ শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যকে নিজের অস্তিত্ব ও মর্যাদার জন্য কতটা প্রয়োজনীয় মনে করেছে ও এ বিষয়ে কতটা সচেতন হয়েছে, সেই সাথে বর্তমান অবস্থা পরিবর্তন করে তাদের কাঙ্ক্ষিত সমাজ প্রতিষ্ঠায় তাদের মধ্যে কতটা উদ্যোগ ও কর্মতৎপরতা সৃষ্টি হয়েছে তার ওপর। এর পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ যে উপাদান ও নিয়ামক আবশ্যক তা হল এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য সঠিক পরিকল্পনা এবং এটি বাস্তবায়নের জন্য সঠিক ও যোগ্য নেতৃত্ব।

নিঃসন্দেহে এ ধরনের বিশ্বজনীন সমাজ প্রতিষ্ঠা কেবল এমন ঐশী নেতৃত্বের মাধ্যমেই সম্ভব যিনি মানব সমাজকে বস্তুগত ও অবস্তুগত পূর্ণতা ও উৎকর্ষের শীর্ষে উত্তরণের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অধিকারী হবেন এবং ভুল-ত্রুটির ঊর্ধ্বে ও আধ্যাত্মিকতার সর্বোচ্চ পর্যায়ে অবস্থান করবেন। কারণ, যে ব্যক্তি এমন জ্ঞানের অধিকারী নয় কিংবা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ভুল-ত্রুটির সম্মুখীন এবং নৈতিকভাবেও পরিশুদ্ধ নয় সে কখনই সঠিক পরিকল্পনা প্রদান ও (ব্যক্তিগত, গোত্রীয়, জাতীয় ও দলীয়) স্বার্থপরতার ঊর্ধ্বে উঠতে সক্ষম নয়। যদি শাসক নিজেই ন্যায়পরায়ণ ও পরিশুদ্ধ না হয় তার পক্ষে সমাজে ন্যায় ও শান্তি

প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। সুতরাং বিশ্বব্যাপী শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য একদল উপযুক্ত ও পরিশুদ্ধ ব্যক্তিত্ব প্রয়োজন যারা ন্যায়ের পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করবে ও ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করবে যদিও এটি তাদের স্বার্থের প্রতিকূলে হয়। কুরআন উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য সম্বলিত নেতৃত্বকে 'উলুল আম্‌র' (সূরা নিসা : ৫৯) এবং এরূপ নেতৃত্বের সহযোগীদের 'ইবাদুন সালেহ' (সূরা আম্বিয়া : ১০৫) বলে অভিহিত করেছে। আর যে বিধি-বিধান ও পরিকল্পনা বিশ্বে বাস্তবায়িত হলে বিশ্বব্যাপী শান্তিপূর্ণ ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে বলে উল্লেখ করেছে তা হল ইসলামী শরীয়ত।

সামগ্রিক এ বিষয়টিকে মহান আল্লাহ্ নিম্নোক্ত আয়াতে এভাবে বর্ণনা করেছেন : 'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদের এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত করবেন তাদের দীনকে যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং অবশ্যই তাদের ভয়ভীতির পরিবর্তে তাদেরকে নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার দাসত্ব করবে এবং আমার সঙ্গে কোন কিছুকে অংশী করবে না...।' (সূরা নূর : ৫৫)

কোন জীবন ব্যবস্থা কেবল তখনই তাকে বিশ্বজনীন বলে দাবি করতে পারে যখন তার বিশ্বদৃষ্টি নিরপেক্ষ ও সর্বজনীন হবে। একমাত্র ইসলামই এমন সর্বজনীনতা ও নিরপেক্ষতা দাবি করতে পারে। কারণ, ইসলাম তার বিশ্বজনীনতার বৈশিষ্ট্য তাওহীদ (একত্ববাদ) থেকে লাভ করেছে। তাওহীদ এমন একটি বিষয় যার আহ্বান মানুষের বর্ণ, ভাষা, জাতি, দেশ ও বংশ-গোত্রের পরিমণ্ডল পেরিয়ে মানুষের মৌলিক ও সাধারণ বৈশিষ্ট্যকে– যেমন বুদ্ধিবৃত্তি, সহজাত ঐশী ও সত্যমুখী প্রবণতা (ফিতরাত), নৈতিকতা, মানবিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ এবং আত্মিক উৎকর্ষকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। যেহেতু তাওহীদী বিশ্বদৃষ্টি মহান আল্লাহ্‌কে সকল কিছুর স্রষ্টা ও পরিচালক বলে জানে যিনি সকল মানুষকে একই উপাদান থেকে সৃষ্টি করেছেন ও তাদের সকলকে একই দৃষ্টিতে দেখেন এবং তাদের পূর্ণতার সকল দিক সম্পর্কে অবহিত, সেহেতু তিনি এ লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য সর্বোত্তম জীবন ব্যবস্থা প্রণয়ন করেছেন। ন্যায়ভিত্তিক এ জীবন ব্যবস্থা পূর্ণরূপে বাস্তবায়নের দায়িত্ব তিনি সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (সা.) এবং তাঁর বংশধারার পবিত্র ইমামদের ওপর অর্পণ করেছেন। তাঁরা তাঁদের সমগ্র জীবনে এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের প্রচেষ্টায় রত ছিলেন। কিন্তু সত্যের বিরোধীদের অপচেষ্টা ও ষড়যন্ত্রের কারণে তাঁরা তা বাস্তবায়নে সক্ষম হননি।

তবে অন্যায়-অবিচার পৃথিবীতে চিরস্থায়ী কোন বিষয় নয়; বরং পৃথিবীর পরিসমাপ্তি ঘটবে সত্য ও ন্যায়ের চূড়ান্ত বিজয়ের মাধ্যমে।এ প্রতিশ্রুতি মহান আল্লাহ্ এভাবে প্রদান করেছেন : 'তিনিই (আল্লাহ্) সেই সত্তা যিনি তাঁর রাসূলকে সঠিক পথ ও সত্য ধর্মসহ প্রেরণ করেছেন যেন তাকে সকল ধর্মের (জীবন ব্যবস্থা) ওপর বিজয়ী করেন যদিও মুশরিকরা অসন্তুষ্ট হয়।' (সূরা সাফ : ৯) মহান আল্লাহ্‌র এ প্রতিশ্রুতি রাসূল (সা.)-এর বংশধারারই এক ব্যক্তি কর্তৃক সমগ্র বিশ্বে বাস্তবায়িত হবে। রাসূল (সা.) এ সম্পর্কে বলেন : 'ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না আমার আহলে বাইত থেকে এক ব্যক্তি ক্ষমতার অধিকারী হবে যে পৃথিবীকে ন্যায় ও সুবিচারে পূর্ণ করবে।' (মুসনাদে আহমাদ)। সকল মুসলমানের দৃষ্টিতে তিনি হলেন ইমাম মাহদী (আ.)। পৃথিবীর মুক্তিকামী মানুষ তাঁরই আগমনের প্রতীক্ষায় রয়েছে। মহান আল্লাহ্ তাঁর আগমনকে ত্বরান্বিত করুন।

ধর্মতত্ত্ব

বিস্ময়কর গ্রন্থ আল-কুরআন

আহলে সুন্নাতের বর্ণিত হাদীস ও
মনীষীদের দৃষ্টিতে ইমাম মাহ্দী (আ.)

বিস্ময়কর গ্রন্থ আল-কুরআন

গ্যারী মিলার

কুরআন যে কেবল এর প্রতি অনুরক্ত মুসলিমদের দ্বারা একটি 'বিস্ময়কর গ্রন্থ' বলে আখ্যায়িত হয়েছে তা নয়; বরং অমুসলিমদের দ্বারাও তা 'বিস্ময়কর' বলেই আখ্যায়িত হয়েছে। এমনকি যারা ইসলামকে চরমভাবে ঘৃণা করে তারাও একে বিস্ময়কর গ্রন্থ হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

যেসকল অমুসলিম কুরআন নিয়ে গভীরভাবে গবেষণা চালিয়েছেন তাঁদেরকে যে বিষয়টি আশ্চর্যান্বিত করে তা হল তাঁরা যা চিন্তা করেছিলেন কুরআনকে সেভাবে তাঁদের নিকট প্রকাশিত হয়নি। তাঁরা যা মনে করেছিলেন তা হল তাঁদের কাছে চৌদ্দশ' বছর পূর্বের আরব মরুভূমির একটি প্রাচীন গ্রন্থ রয়েছে এবং তাঁরা আশা করেছিলেন যে, বইটি তেমনই হবে– মরুভূমির একটি প্রাচীন বই যেমনটি হওয়ার কথা। অতঃপর তাঁরা দেখেছেন যে, তাঁরা যেমনটি ভেবেছিলেন বইটি মোটেই তেমন নয়।

অধিকন্তু অনেক মানুষই প্রথমে মনে করে যে, যেহেতু এটি মরু অঞ্চলের একটি গ্রন্থ তাই এটি মরুভূমির কথাই বলবে। কিন্তু কুরআন শুধু মরুভূমি সম্পর্কেই কথা বলে না– মরুভূমি সম্পর্কে এতে কিছু বর্ণনা রয়েছে বটে; কিন্তু এটি সাগর সম্পর্কেও কথা বলে, যেমন সাগরে ঝড়ের কবলে পড়লে মানুষের কেমন অনুভূতি হয়।

কয়েক বছর পূর্বে টরোন্টোতে এক ব্যক্তি সম্পর্কে আমি একটি ঘটনা জানতে পারি। এই ব্যক্তি একজন নৌবণিক ছিলেন এবং সাগরেই জীবন যাপন করতেন। একজন মুসলিম তাঁকে কুরআনের একটি অনুবাদ পড়তে দেন। সেই বণিক ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে কিছুই জানতেন না, কিন্তু তিনি কুরআন পড়তে আগ্রহী ছিলেন। পড়া শেষ হলে তিনি কুরআন ঐ মুসলিমকে ফিরিয়ে দেন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, 'এই মুহাম্মাদ (সা.) কি একজন নাবিক ছিলেন?' যেভাবে কুরআন সাগরে ওঠা একটি ঝড়ের নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছে, তাতে তিনি অভিভূত হয়ে পড়েন। তাঁকে

বলা হল, 'না, আসলে মুহাম্মাদ (সা.) মরুভূমিতে বসবাস করতেন।' কেবল এটুকুই তাঁর জন্য যথেষ্ট ছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি কুরআনের বর্ণনা দ্বারা এ কারণেই এতটা প্রভাবিত হয়েছিলেন যে, তিনি সাগরে ঝড়ের কবলে পড়েছিলেন এবং তিনি জানতেন যে, যিনি এমন অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন তিনিও সাগরে ঝড়ের কবলে পড়েছিলেন। 'ঢেউয়ের ওপর ঢেউ, তার ওপর মেঘ'– এ বর্ণনা এমন কোন ব্যক্তির লেখা নয় যে সাগরে ওঠা ঝড় সম্পর্কে কল্পনা করছে; বরং এটি এমন কোন ব্যক্তির লেখা যে জানে যে, সাগরের বুকে ঝড় কেমন হয়! কুরআন যে একটি নির্দিষ্ট স্থান ও সময়ের গণ্ডিতে আবদ্ধ নয়– এটি তার একটি নমুনা মাত্র। নিশ্চিতভাবেই এতে বর্ণনাকৃত বৈজ্ঞানিক ধারণাগুলোও চৌদ্দশ' বছর পূর্বে মরুভূমি থেকে উদ্ভূত বলে মনে হয় না।

মুহাম্মাদ (সা.)-এর নবুওয়াতেরও অনেক শতাব্দী পূর্বে পরমাণু সম্পর্কে গ্রীক দার্শনিক ডেমোক্রিটাস উপস্থাপিত একটি প্রসিদ্ধ তত্ত্ব ছিল। তিনি এবং তাঁর পরবর্তীকালের জনগণ মনে করতেন বস্তুর সবচেয়ে ক্ষুদ্র, অবিনশ্বর ও অবিভাজ্য কণা হল পরমাণু। আরবরাও একই তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিল; বস্তুত আরবি 'যার্‌রা' শব্দটি সাধারণভাবে মানুষের নিকট ক্ষুদ্রতম কণা হিসাবে পরিচিত ছিল।

বর্তমানে আধুনিক বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে যে, বস্তুর এ ক্ষুদ্র একক (যথা পরমাণু– যার মৌলিক পদার্থের মতো একই রকম সকল উপাদান রয়েছে), এর উপাদানগত অংশে বিভক্ত হতে পারে। এটি একটি নতুন ধারণা– গত শতাব্দীর ধারণার অগ্রগতি। আর মজার বিষয় হল, কুরআনে এ তথ্য লিপিবদ্ধ ছিল, যেখানে বলা হয়েছে :

'তিনি (আল্লাহ) বেহেশতে ও পৃথিবীতে একটি পরমাণুর ওজন সম্পর্কে জ্ঞাত এবং যা কিছু এর চেয়েও ক্ষুদ্র...'

নিঃসন্দেহে চৌদ্দশ' বছর আগে এমন বক্তব্য অস্বাভাবিক বলে মনে হয়, এমনকি একজন আরবের কাছেও। তখন তার কাছে 'যার্‌রা' ছিল সবচেয়ে ক্ষুদ্র কণা। তাই এটিই নিশ্চিত প্রমাণ যে, কুরআন বিগত দিনের নিছক কোন গ্রন্থ নয়।

অন্য একটি উদাহরণ হল, কেউ হয়তো একটি পুরাতন গ্রন্থে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয় বা আরোগ্যদানকারী ওষুধ সম্পর্কিত বিষয় খুঁজে পাবে যা পরিত্যক্ত হয়েছে। অনেক ঐতিহাসিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) স্বাস্থ্য ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে কতিপয় উপদেশ দিয়েছিলেন যার অধিকাংশই কুরআনে বর্ণিত হয়নি। অমুসলিমদের নিকট প্রথম দৃষ্টিতে এটাকে নিতান্তই অমনোযোগিতাজনিত অবহেলা বলে মনে হতে পারে। তারা বুঝতে পারে না, কেন আল্লাহ এমন উপকারী তথ্য

কুরআনের অন্তর্ভুক্ত করেননি। কতিপয় মুসলমান এগুলোর অনুপস্থিতিকে এ যুক্তিতে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন যে, যদিও মহানবী (সা.)-এর উপদেশ তিনি যে যুগে বসবাস করতেন সে যুগের উপযোগী ও সঠিক ছিল, কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর অসীম জ্ঞানের কারণে জানতেন যে, পরবর্তীকালে চিকিৎসাশাস্ত্র ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি হবে যা মহানবীর উপদেশকে বাতিল করে দেবে। যখন পরবর্তী আবিষ্কারের ঘটনা ঘটবে তখন মানুষ বলতে পারে যে, এমন তথ্য মহানবীর দেয়া উপদেশের সাথে সাংঘর্ষিক। যেহেতু আল্লাহ্ কখনই কোন অমুসলিমকে এ সুযোগ দেবেন না যে, তারা দাবি করতে পারে কুরআনের মধ্যে ভিন্নতা বা দ্বন্দ্ব রয়েছে অথবা কুরআনে রাসূলের শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক বিষয় রয়েছে, সেহেতু তিনি কুরআনে কেবল সেসব তথ্য ও উদাহরণ অন্তর্ভুক্ত করেছেন যা কালোত্তীর্ণ হতে পারে।

যা হোক, যখন কেউ ঐশী প্রত্যাদেশ হিসাবে কুরআনের বাস্তবতা যাচাই করে, তখন এর পেছনের মূল বিষয়টি তার নিকট প্রতিভাত হয় এবং এমন যুক্তির ভ্রান্তিও স্পষ্ট ও বোধগম্য হয়ে যায়। এটি অবশ্যই বুঝতে হবে যে, কুরআন একটি ঐশী প্রত্যাদেশ এবং এর সকল তথ্য ঐশী সূত্রে প্রাপ্ত। আল্লাহ্ নিজেই কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। এটি হল আল্লাহ্র কথা যা সৃষ্টির পূর্বেই ছিল এবং অতঃপর তাতে কিছুই যুক্ত, বিযুক্ত অথবা পরিবর্তিত হতে পারে না। বস্তুত কুরআন মহানবী (সা.)-এর জন্মের পূর্বেই অস্তিত্বমান ও সম্পূর্ণ ছিল। তাই মহানবীর নিজের কোন কথা বা উপদেশ এতে থাকা সম্ভব ছিল না। এমন তথ্যের অন্তর্ভুক্তি, কুরআনের অস্তিত্ব যে উদ্দেশ্যে তার সাথে সুস্পষ্টভাবে সাংঘর্ষিক হয়ে পড়বে এবং ঐশী প্রত্যাদেশ হিসাবে এর অকাট্য হওয়াকে প্রত্যাখ্যান করবে।

ফলে কুরআনে কোন বিষয় নেই যা বাতিল বলে দাবি করা যেতে পারে; আর না এটি মানুষের কোন দৃষ্টিভঙ্গি ধারণ করে যে, মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য কোন্টি উপকারী, কোন্ খাবার উৎকৃষ্ট অথবা কোন্টি কোন্ রোগের নিরাময় করবে। বাস্তবে কুরআন চিকিৎসা সংক্রান্ত একটি বিষয় বর্ণনা করেছে এবং এটি নিয়ে কেউ বিতর্ক করেনি। কুরআন বলছে যে, মধুর মধ্যে রোগের নিরাময় রয়েছে এবং নিশ্চিতভাবেই আমি মনে করি না যে, কেউ এটি নিয়ে বিতর্ক করবে।

যদি কেউ ধারণা করে যে, কুরআন একজন মানুষের চিন্তার ফসল, তাহলে কেউ হয়তো এ আশা করবে যে, যে ব্যক্তি তা রচনা করেছে তার মনে যা উদয় হয় তার প্রতিফলন এখানে ঘটবে। কতিপয় এনসাইক্লোপিডিয়া এবং নানা বইয়ে দাবি করা হয়েছে যে, কুরআন হল মুহাম্মাদ (সা.)-এর হেলুসিনেশনের (মতিভ্রমের) ফসল। যদি এ দাবি সত্য হয়, যদি তা মুহাম্মাদ (সা.)-এর মানসিক সমস্যা থেকে উৎপত্তি

লাভ করে থাকে, তাহলে কুরআনে তার প্রমাণ স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হবে। সেখানে কি এমন কোন প্রমাণ আছে? এটি নির্ধারণের জন্য একজনকে প্রথমে বিভিন্ন সময়ে তাঁর মনে কোন্ কোন্ বিষয়ের উদ্ভব হয়েছিল তা চিহ্নিত করতে হবে এবং তারপর কুরআনে এসব চিন্তার প্রতিফলন হয়েছিল কি না তা গবেষণা করে বের করতে হবে।

এটি সবার জানা আছে যে, মুহাম্মাদ (সা.)-এর জীবন খুব কঠিন ছিল। একজন কন্যা (হযরত ফাতিমা) ছাড়া তাঁর অন্য সকল সন্তান তাঁর চোখের সামনে মৃত্যুবরণ করে এবং তাঁর একজন স্ত্রী (হযরত খাদীজা)– যিনি তাঁর কাছে খুবই প্রিয় এবং গুরুত্বপূর্ণ মহিলা ছিলেন এবং যাঁর সাথে তিনি দীর্ঘ পঁচিশ বছর পরম সুখে সংসার জীবন অতিবাহিত করেছেন তিনিও মারা যান তাঁর জীবনের কঠিন সময়ে। প্রকৃতপক্ষে তিনি একজন পরিপূর্ণ নারী ছিলেন। কারণ, যখন মহানবীর ওপর প্রথম ওহী অবতীর্ণ হয় তখন তিনি দ্রুত তাঁর স্ত্রীকে এ তথ্য অবগত করার জন্য বাড়িতে চলে আসেন। এমনকি আজও কঠিন অবস্থার মধ্যে পতিত কোন আরবকে পাওয়া যাবে না– যে বলবে, 'আমি প্রকম্পিত হয়েছিলাম এবং দ্রুত বাড়িতে আমার স্ত্রীর সান্নিধ্যে চলে গিয়েছিলাম।' তারা কখনও এমন করে না। অথচ মুহাম্মাদ (সা.) তাঁর স্ত্রীর কাছে সেই প্রশান্তি অনুভব করতেন বলেই তা করতে পেরেছিলেন। তিনি এমনই প্রভাব বিস্তারকারী ও মানসিক শক্তির অধিকারিণী ছিলেন। যদিও এগুলো মুহাম্মাদ (সা.)-এর মনে উদয় হওয়া বিষয়গুলোর মধ্যে স্বল্প, কিন্তু আমার যুক্তি প্রমাণের জন্য এ ঘটনাগুলোর সুগভীরতাই যথেষ্ট। পবিত্র কুরআন এসব ঘটনার কোনটিই উল্লেখ করেনি– না তাঁর সন্তানদের মৃত্যু, না তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রীর মৃত্যু, না প্রথম ওহী নাযিলের সময় তাঁর অবস্থা যা তিনি তাঁর স্ত্রীর সাথে চমৎকারভাবে ভাগ করে নিয়েছিলেন– কোনটিই; যদিও এ বিষয়গুলো তাঁকে চিন্তিত করত এবং ব্যথিত ও দুঃখিত করত। কিন্তু এসব বিষয় অথবা আরও অনেক বিষয় ব্যাপকভাবে অথবা ন্যূনপক্ষে কোথাও উল্লেখ করা হয়নি।

কুরআনের একটি সত্যিকার বিজ্ঞানসম্মত উপস্থাপনা সম্ভব। কারণ, কুরআন এমন কিছু বিষয় প্রস্তাব করে যা অন্য কোন ধর্মগ্রন্থ করেনি। আর বিজ্ঞানীরা এটিই দাবি করেন। বর্তমান বিশ্বে অনেক লোকই আছে যাদের কাছে বিশ্বজগৎ কীভাবে কাজ করে তার ধারণা বা তত্ত্ব আছে। এসব লোক সব জায়গায়ই রয়েছে, কিন্তু বিজ্ঞানীরা এমনকি তাদের কোন কথা শুনতেও আগ্রহী নন। এটি এজন্য যে, গত শতকে বিজ্ঞানীরা কোন তত্ত্বের সত্যতা প্রমাণের জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার দাবি করেছেন। তাঁরা বলেছেন, 'যদি তুমি কোন তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চাও, এটি নিয়ে আমাদের বিরক্ত কর

না যতক্ষণ না সেই তত্ত্বের সাথে আমাদের জন্য একটি পদ্ধতি উপস্থাপন কর যার মাধ্যমে তুমি ভুল কি না তা প্রমাণ করা যায়।'

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে আইনস্টাইনের প্রতি বিজ্ঞানীরা এজন্যই কর্ণপাত করেছিলেন। তিনি একটি নতুন তত্ত্ব দিয়ে বলেছিলেন : 'আমি বিশ্বাস করি, বিশ্বজগৎ এভাবে কাজ করে এবং এ তত্ত্বের ভ্রান্তি প্রমাণের জন্য তিনটি পদ্ধতি রয়েছে।' সুতরাং বিজ্ঞানীরা একে পরীক্ষার বিষয় হিসাবে গ্রহণ করেন এবং ছয় বছরের মধ্যেই তিনটি পরীক্ষায়ই বিষয়টি উত্তীর্ণ হয়। আর এটিই প্রমাণ করে যে, তাঁর কথায় কর্ণপাত করতেই হত। কারণ, তিনি বলেছিলেন : 'এটি আমার তত্ত্ব; আর যদি তোমরা আমাকে ভুল প্রমাণ করতে চাও, তবে এটি কর অথবা ঐটি কর।' আর কুরআনে ঠিক এ বিষয়টিই রয়েছে– সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের পরীক্ষা। কিছু সংখ্যক বিষয় পুরাতন (যেগুলো এর মধ্যেই সত্য প্রমাণিত হয়েছে) এবং কিছু সংখ্যক এখনও চলমান। প্রকৃতপক্ষে কুরআন বলে, 'যদি এ গ্রন্থ যা দাবি করে তা সঠিক না হয়, তবে তোমরা একে মিথ্যা প্রমাণের জন্য এটি কর অথবা ঐটি কর।' নিঃসন্দেহে চৌদ্দশ' বছরে কেউই এটি বা ঐটি করতে সক্ষম হয়নি; আর তাই আজও এটি সত্য ও নির্ভরযোগ্য বলে পরিগণিত। আমি আপনাকে পরামর্শ দেই যে, আপনি যদি ইসলাম সম্পর্কে কারও সাথে বিতর্কে লিপ্ত হন এবং সে দাবি করে যে, তার কাছে সত্য রয়েছে, আর আপনি অন্ধকারে রয়েছেন, তবে অন্য সকল যুক্তি পরিত্যাগ করে তাকে কেবল এটি জিজ্ঞাসা করেন যে, আপনার ধর্মে কি সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের কোন ব্যবস্থা রয়েছে? আপনার ধর্মে কি এমন কোন পদ্ধতি রয়েছে যার মাধ্যমে আমি চাইলে আপনার ধর্মকে মিথ্যা প্রমাণ করতে পারব?' এখন আমি আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, সেই ব্যক্তির কোন কিছুই নেই– না যাচাই-বাছাই, না প্রমাণ, কিছুই না। এটি এ কারণে যে, তারা এমন ধারণা পোষণ করে না যে, তারা কেবল তাদের বিশ্বাসই উপস্থাপন করবে না; বরং তারা অন্যদের নিকট তারা যে ভ্রান্ত তা প্রমাণ করার সুযোগও দেবে। অন্যদিকে ইসলাম এ কাজটিই করে। ইসলাম কীভাবে একজন মানুষকে এর নির্ভরযোগ্যতা যাচাই ও একে মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য সুযোগ দেয় তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ সূরা নিসায় দেয়া হয়েছে। আর সত্যি বলতে কী, যখন আমি এ চ্যালেঞ্জ প্রথম দেখি তখন খুবই অবাক হয়েছিলাম। এটি বলছে :

'তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা করে না? যদি তা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও পক্ষ হতে হত, তারা নিশ্চয়ই এতে অনেক অসংগতি দেখতে পেত।'

এ আহ্বান অমুসলিমদের প্রতি একটি সুস্পষ্ট চ্যালেঞ্জ। প্রকৃতপক্ষে কুরআন তাকে ভুল বের করার জন্য আহ্বান জানায়। আসলে একদিকে এ চ্যালেঞ্জের দৃঢ়তা এবং

কাঠিন্যের পাশাপাশি চ্যালেঞ্জের এমন যথার্থ উপস্থাপনা মানব-প্রকৃতির মধ্যে নেই এবং মানুষের ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রেও তা সামঞ্জস্যশীল নয়। কেউ স্কুলে কোন পরীক্ষা দেয়ার পর পরীক্ষকের নিকট এমন নোট লেখে না যে, 'এ পরীক্ষা নির্ভুল। এর মধ্যে কোন ভুল-ভ্রান্তি নেই। যদি পারেন তবে ভুল বের করেন।' কেউ এমন করে না। তাহলে শিক্ষকও ভুল না বের করে ঘুমোতে যাবেন না। আর কুরআন মানুষের কাছে এভাবেই চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে।

কুরআনের আরেকটি চমৎকার বৈশিষ্ট্য হল এটি বারবার এর পাঠকের প্রতি উপদেশ দ্বারা কাজ করেছে। কুরআন পাঠককে বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে তথ্য দিয়েছে এবং এরপর উপদেশ দিয়েছে : 'যদি তুমি এটি বা ঐটি সম্পর্কে আরও জানতে চাও অথবা বর্ণিত বিষয়ে সন্দেহ কর, তবে যারা জানে তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর।' এ বিষয়টিও একটি আশ্চর্যজনক বৈশিষ্ট্য। এটি কখনও স্বাভাবিক নয় যে, ভূগোল, উদ্ভিদবিদ্যা, জীববিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ে যার প্রশিক্ষণ নেই এমন একজন মানুষ একটি গ্রন্থে এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছে এবং পাঠককে বলেছে যে, যদি সে কোন বিষয়ে সন্দেহ-সংশয়ে পতিত হয় তবে যেন জ্ঞানী ব্যক্তিদের তা জিজ্ঞাসা করে।

এখন পর্যন্ত প্রতি যুগে মুসলমানরা কুরআনের উপদেশ অনুসরণ করেছে এবং আশ্চর্যজনক বস্তু বা জিনিস আবিষ্কার করেছে। যদি কেউ অনেক শতাব্দী পূর্বে মুসলিম বিজ্ঞানীদের রচনাবলীর প্রতি লক্ষ্য করে, তাহলে দেখতে পাবে যে, সেগুলো কুরআনের উক্তিতে পূর্ণ। এসব রচনা প্রমাণ করে যে, তাঁরা কোন কিছু অনুসন্ধানের জন্য কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে গবেষণাকর্ম চালিয়েছিলেন। আর তাঁরা নিশ্চিত করেছেন যে, তাঁরা সেসব ক্ষেত্রে অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন যেসব ক্ষেত্রে কুরআনই তাঁদেরকে গবেষণা করতে বলেছিল। উদাহরণস্বরূপ, কুরআন মানুষের উৎপত্তি সম্পর্কে উল্লেখ করেছে এবং তারপর পাঠককে বলেছে, এ বিষয়ে গবেষণা কর। এটি পাঠককে কোথায় অনুসন্ধান করতে হবে তার একটি ইঙ্গিত দিয়েছে এবং তারপর বলেছে যে, একজনকে এ সম্পর্কে আরও জানা উচিত।

এটি এমন বিষয় যা বর্তমানে মুসলমানরা ব্যাপকভাবে তত্ত্বাবধান করছে– কিন্তু সবসময় নয়, নিচের উদাহরণে তা বর্ণনা করা হল। কয়েক বছর আগে সৌদি আরবের রিয়াদের একদল লোক এমব্রিয়লজি (ভ্রূণতত্ত্ব) বা মাতৃগর্ভে ভ্রূণের বিকাশ নিয়ে কুরআনের সকল আয়াত একত্র করেন। তাঁরা বলেন : 'কুরআন এ সম্পর্কে যা বলে তা হল এই। এটি কি সত্য?' এক্ষেত্রে তাঁরা কুরআনের নির্দেশনা গ্রহণ করেন : 'যারা জানে তাদের জিজ্ঞাসা কর।' তাঁরা এ বিষয়ের জন্য টরন্টো ইউনিভার্সিটির ভ্রূণতত্ত্বের অমুসলিম প্রফেসর ড. কিথ মুরকে নির্বাচন করেন। ড. কিথ মুর ভ্রূণতত্ত্বের

পাঠ্যপুস্তকের লেখক এবং একজন বিশ্বমানের পণ্ডিত ব্যক্তি। তাঁরা তাঁকে রিয়াদে আমন্ত্রণ জানান এবং বলেন : 'আপনার বিষয়ে কুরআন এ কথাগুলোই বলে। এগুলো কি সত্য? এ বিষয়ে আপনি আমাদের কী বলতে পারেন?' তাঁর রিয়াদে থাকাকালীন সেসব আয়াতের অনুবাদ ও অন্যান্য ক্ষেত্রে তিনি যেসব সহযোগিতা চেয়েছিলেন তার সবই তাঁরা তাঁকে দেন। ড. মুর সেগুলোর মধ্য থেকে যা কিছু খুঁজে পান তাতে এত বেশি আশ্চর্যান্বিত হন যে, তিনি তাঁর পাঠ্যপুস্তকগুলোকে পরিবর্তন করেন। বস্তুত ভ্রূণতত্ত্বের ইতিহাস সম্পর্কিত তাঁর 'আমাদের জন্মের পূর্বে' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে তিনি এমন কিছু বিষয় সংযোজন করেন যেগুলো প্রথম সংস্করণে ছিল না এবং এগুলো তিনি কুরআনে পেয়েছিলেন। আর এটিই প্রমাণ করে যে, কুরআন তার সময়ের চেয়ে অগ্রগামী ছিল এবং যাঁরা কুরআনে বিশ্বাস করেন তাঁরা যা জানেন তা অন্যরা জানে না।

একটি টেলিভিশন অনুষ্ঠানের জন্য ড. কিথ মুরের সাক্ষাৎকার নেয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল এবং আমরা এ বিষয়ে অনেক আলোচনা করেছিলাম। এগুলো স্লাইড এবং অন্যান্য মাধ্যমে দেখানো হয়েছিল। তিনি উল্লেখ করেন যে, মানুষের বিকাশের ক্ষেত্রে কিছু বিষয় কুরআন বর্ণনা করেছে যেগুলো ত্রিশ বছর পূর্বেও মানুষ জানত না। বস্তুত তিনি বলেন, বিশেষ করে, কুরআনে ভ্রূণ বিকাশের একটি পর্যায় 'আলাকা' (জোঁকের মতো জমাট রক্তবিন্দু) সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা তাঁর কাছে ছিল একদম নতুন; কিন্তু যখন তিনি তা পরীক্ষা করলেন তখন দেখলেন যে, তা সত্য এবং তিনি তাঁর গ্রন্থে এ বিষয়টি সংযোজন করেন। তিনি বলেন, 'আমি এ সম্পর্কে পূর্বে কখনই চিন্তা করিনি।' এবং তিনি প্রাণীবিদ্যা বিভাগে গেলেন এবং জোঁকের ছবি চাইলেন। যখন তিনি দেখলেন যে, এটি দেখতে মানবভ্রূণের মতো, তখন তিনি এ দু'টি ছবিই তাঁর পাঠ্যপুস্তকে সন্নিবেশিত করার সিদ্ধান্ত নিলেন। ড. মুর ক্লিনিক্যাল এমব্রিয়লজির ওপর একটি গ্রন্থও রচনা করেন এবং যখন তিনি এ তথ্য টরন্টোতে উপস্থাপন করেন, তখন সমগ্র কানাডাজুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি করে। কানাডার কয়েকটি পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় তা ছাপা হয় এবং কয়েকটি পত্রিকার শিরোনাম ছিল মজার। যেমন একটি পত্রিকার শিরোনাম হচ্ছে : 'প্রাচীন গ্রন্থে আশ্চর্যজনক বিষয় প্রাপ্তি'।

এ উদাহরণ থেকে মনে হয় যে, মানুষ পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারেনি যে, বিষয়টি কী। একটি পত্রিকার রিপোর্টার প্রফেসর মুরকে প্রশ্ন করেন : 'আপনি কি মনে করেন যে, আরবরা হয়তো এসব বিষয় সম্পর্কে জানত– ভ্রূণ, এর অবস্থা এবং এটি কীভাবে পরিবর্তিত হয় ও বেড়ে ওঠে? হয়তো সেখানে কোন বিজ্ঞানী ছিলেন না, কিন্তু তারা

কোনভাবে এ বিষয়টির ব্যবচ্ছেদ করে– মানুষকে ব্যবচ্ছেদ করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালায়।'

প্রফেসর মুর তাৎক্ষণিকভাবে তাঁকে বলেন যে, তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ভুলে গেছেন। ভ্রুণ সংক্রান্ত সকল স্লাইড এবং ফিল্মে যা প্রজেক্টরের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে তার সকল ছবিই মাইক্রোসকোপ দিয়ে তোলা হয়েছে। তিনি বলেন, 'চৌদ্দশ' বছর পূর্বে কেউ ভ্রূণতত্ত্ব আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন কি না এটা কোন বিষয়ই নয়, কেননা, তারা তা দেখতে পেতেন না।' ভ্রূণের আকৃতি-প্রকৃতি সম্পর্কে কুরআনে যেসব বর্ণনা এসেছে সেগুলো খালি চোখে দেখার মতো বিষয় নয়; এগুলোর জন্য মাইক্রোসকোপের প্রয়োজন। অথচ এ ধরনের যন্ত্র মাত্র দু'শ' বছরের কিছু পূর্বে আবিষ্কৃত হয়েছে।' ড. মুর ব্যঙ্গ করে বলেন, 'হয়তো চৌদ্দশ' বছর পূর্বে কারও কাছে গোপন মাইক্রোসকোপ ছিল; সে এই গবেষণা করেছে এবং কোন স্থানেই ভুল করেনি। তারপর সে তা যে কোনভাবে মুহাম্মাদ (সা.)-কে শিক্ষা দিয়েছে এবং তাঁকে এ তথ্যটি তাঁর বইয়ে সন্নিবেশিত করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছে। তারপর সে তার সকল উপকরণ ধ্বংস করে ফেলেছে এবং বিষয়টিকে চিরদিনের জন্য গোপন করেছে। আপনি কি তা বিশ্বাস করেন? আপনার অবশ্যই তা করা উচিত নয় যতক্ষণ না আপনি এর সপক্ষে কোন প্রমাণ উপস্থাপন করছেন। কারণ, এটি একটি হাস্যকর তত্ত্ব।' বস্তুত যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল : 'কুরআনে বর্ণিত এসব তথ্যকে আপনি কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন?' ড. মুরের উত্তর ছিল : 'এটি একমাত্র ঐশী প্রত্যাদেশের মাধ্যমেই হতে পারে।'

যদিও কুরআনে বর্ণিত তথ্য নিয়ে মানুষের গবেষণার উপরোল্লিখিত উদাহরণ একজন অমুসলিমের সাথে সম্পর্কিত, তবুও তা নিশ্চিতভাবেই গ্রহণযোগ্য; কারণ, তিনি গবেষণা সংশ্লিষ্ট এ বিষয়ে জ্ঞানীদেরই অন্যতম। যদি কোন আনাড়ি ব্যক্তি দাবি করত যে, ভ্রূণ সম্পর্কে কুরআনে যা বর্ণিত হয়েছে তা সত্য তবে অন্য কারও এটি মেনে নেয়ার কোন প্রয়োজন হত না। যা হোক, মানুষ জ্ঞানী ও মনীষীদের প্রতি যে উচ্চ মর্যাদা, সম্মান এবং শ্রদ্ধা দেখায়, তাতে একজন স্বাভাবিকভাবেই ধারণা করে যে, যদি তাঁরা কোন বিষয়ে গবেষণা করেন এবং ঐ গবেষণার ভিত্তিতে কোন ফলাফলে পৌঁছান, তাহলে তা গ্রহণযোগ্য।

প্রফেসর মুরের একজন সহকর্মী মার্শাল জনসন টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভিদবিদ্যা নিয়ে ব্যাপকভাবে গবেষণা করেন। ভ্রূণের বিকাশের ব্যাপারে কুরআনের বর্ণনার সত্যতা জানতে পেরে তিনি খুবই আগ্রহান্বিত হয়ে পড়েন এবং তিনি মুসলমানদেরকে

তাঁর বিষয় নিয়ে কুরআনে যেসব বর্ণনা আছে তা একত্র করে তাঁকে দেয়ার জন্য আহ্বান জানান। আবারও মানুষ অনেক বিষয়ে আশ্চর্যান্বিত হয়।

কুরআনে অনেক বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এবং প্রতিটি বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য প্রচুর সময়ের প্রয়োজন। আমাদের আলোচনার জন্য এটিই যথেষ্ট যে, কুরআন খুব স্পষ্টভাবে এবং সংক্ষেপে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে বর্ণনা করেছে এবং উপর্যুপরি তার পাঠককে এসব বর্ণনার নির্ভরযোগ্যতা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের গবেষণার ভিত্তিতে যাচাই-বাছাই করতে উপদেশ দিয়েছে। নিঃসন্দেহে এটি কুরআনের একটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য যা অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না। এটি আশ্চর্যের বিষয় যে, যখনই কুরআন কোন তথ্য দিয়েছে তখনই এর পাঠককে বলেছে : 'তোমরা এগুলো পূর্বে জানতে না।' নিশ্চিতভাবেই এমন কোন ধর্মগ্রন্থ নেই যেখানে এমন দাবি করা হয়েছে। মানুষের কাছে অন্য যে সব প্রাচীন গ্রন্থ ও ধর্মগ্রন্থ রয়েছে সেসব মানুষকে প্রচুর তথ্য দিয়েছে, তবে সেগুলো সবসময় এসব তথ্যের উৎস উল্লেখ করেছে।

যেমন যখন বাইবেল প্রাচীন কোন ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করে, তখন এটা বলে যে, এই বাদশা এখানে বসবাস করত, এই ব্যক্তি অমুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল, এক ব্যক্তির এতজন সন্তান ছিল ইত্যাদি। একই সাথে এগুলো বলে যে, যদি তুমি এ সম্পর্কে আরও জানতে চাও তবে অমুক বই দেখতে পার যেহেতু এগুলো সেখান থেকে নেয়া হয়েছে। এর বিপরীতে কুরআন তার পাঠককে কোন তথ্য দিয়ে বলে যে, 'এ তথ্যটি নতুন।' আর সেখানে সবসময় তথ্যগুলো নিয়ে গবেষণা করার কথা ও সত্যতা যাচাইয়ের উপদেশ দেয়া হয়। এটা আশ্চর্যের বিষয় যে, চৌদ্দশ' বছর পূর্বে এমন মতবাদ অমুসলিম কর্তৃক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়নি। নিশ্চয় মক্কার অধিবাসীরা যারা মুসলমানদের ঘৃণা করত এবং বারবার তারা শুনত যে, এমন ঐশী প্রত্যাদেশ নতুন তথ্য দেয়ার দাবি করছে, তারপরও তারা বলেনি যে, 'এটি নতুন নয়। আমরা জানি, মুহাম্মাদ কোথা থেকে এ তথ্য পেয়েছে। আমরা এটি স্কুলে শিখেছি।'

তারা কখনই এর নির্ভরযোগ্যতাকে চ্যালেঞ্জ করেনি। কারণ, আসলেই তা নতুন ছিল। কুরআনে তথ্য সম্পর্কে গবেষণা করার উপদেশ থাকায় হযরত উমর তাঁর খেলাফতকালে একটি দলকে যুল কারনাইনের দেয়াল খুঁজে বের করার জন্য প্রেরণ করেন। কুরআনের প্রত্যাদেশের পূর্বে আরবরা এমন দেয়ালের কথা কখনও শোনেনি, কিন্তু যেহেতু কুরআন এটা বর্ণনা করেছে, তাই তারা এটি আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়। প্রকৃতপক্ষে বর্তমানে এর অবস্থান হল (সাবেক) সোভিয়েত ইউনিয়নের দারবান্দ (কাস্পিয়ান সাগরের নিকট দাগেস্তানের ককেশাস পর্বতের একটি অংশে)।

এখানে অবশ্যই জোর দেয়া প্রয়োজন যে, কুরআন অনেক অনেক বিষয়ে নির্ভুল, কিন্তু নির্ভুলতার মানেই এ নয় যে, সেই গ্রন্থটি ঐশী। বস্তুত নির্ভুলতা ঐশী প্রত্যাদেশের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

উদাহরণস্বরূপ, টেলিফোন বই নির্ভুল, কিন্তু এর মানে এ নয় যে, সেটি ঐশী প্রত্যাদেশ। সত্যিকার সমস্যা এখানে লুকিয়ে আছে যে, একজনকে অবশ্যই কুরআনের তথ্যের উৎস সম্পর্কে কিছু প্রমাণ উপস্থাপন করতে হবে। জোর দেয়া হয়েছে পাঠকের ওপর। কুরআনের নির্ভরযোগ্যতাকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না। যদি নিশ্চিতভাবেই কেউ কোন ত্রুটি খুঁজে পায় তবে তার এটি প্রত্যাখ্যান করার অধিকার আছে। আর কুরআন এই বিষয়টিকেই উৎসাহিত করে। একদা দক্ষিণ আফ্রিকায় আমার এক বক্তৃতার পর এক ব্যক্তি আমার কাছে এগিয়ে এল। আমি যা বলেছি সে বিষয়ে সে ভীষণ ক্রুদ্ধ এবং সে দাবি করল : 'আজ রাতে আমি বাড়ি যাব এবং কুরআনের একটি ভুল খুঁজে বের করব।' 'অবশ্যই', আমি বললাম, 'স্বাগতম। তুমি সবচেয়ে বিচক্ষণ কথা বলেছ।'

নিশ্চিতভাবেই যারা কুরআনের নির্ভরযোগ্যতার বিষয়ে সন্দেহ করে তাদের সাথে মুসলমানদের এভাবেই কথা বলা প্রয়োজন। কারণ, কুরআন নিজেই এই চ্যালেঞ্জ আহ্বান করছে। এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার পর যখন তারা একে সত্য বলে আবিষ্কার করবে তখন এসব লোক একে বিশ্বাস করবে। কারণ, তারা একে বাতিল প্রতিপন্ন করতে পারবে না। ফলে কুরআন তাদের কাছে মর্যাদা পাবে। কারণ, তারা নিজেরাই এর নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করেছে।

(চলবে)

অনুবাদ : মিকদাদ আহমেদ

(তেহরান, ইরান থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক ম্যাগাজিন 'ইকো অব ইসলাম', স্প্রিং ২০০৬ থেকে অনূদিত।)

আহ্‌লে সুন্নাতের বর্ণিত হাদীস ও মনীষীদের দৃষ্টিতে ইমাম মাহ্‌দী (আ.)

'আর সে হচ্ছে কিয়ামতের একটি নিদর্শন।' (সূরা যুখরুফ : ৬১)

আহ্‌লে সুন্নাতের নিকট সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য হাদীস সংকলন ছয়টি যা 'সিহাহ্ সিত্তাহ্' নামে পরিচিত। হাদীসের প্রামাণ্যতা ও গ্রহণযোগ্যতা যাচাই করার জন্য আহ্‌লে সুন্নাতের হাদীস সংকলকগণ যে সব মূলনীতি প্রণয়ন করেছেন এ ছ'টি সংকলন সে সব মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ ছ'টি গ্রন্থ হচ্ছে : সহীহ্ আল বুখারী, সহীহ্ আল মুসলিম, সহীহ্ আত্ তিরমিযী, সুনানে ইবনে মাজাহ্, সুনানে আবু দাউদ ও সহীহ্ আন্ নাসাঈ। ইমাম মাহ্‌দী (আ.) সম্পর্কে সিহাহ্ সিত্তাহ্ ও আহ্‌লে সুন্নাতের অন্যান্য সূত্রে অসংখ্য হাদীস রয়েছে। এখানে উদ্ধৃত নিম্নোক্ত হাদীস ও বর্ণনাগুলো এমন যেগুলোর সত্যতা ও প্রামাণ্যতার ব্যাপারে আহ্‌লে সুন্নাতের হাদীস বিশারদগণ একমত।

১. মহানবী (সা.) বলেছেন : 'এমনকি সমগ্র বিশ্বের আয়ু যদি শেষ হয়ে গিয়ে থাকে এবং কিয়ামত হতে একদিনও অবশিষ্ট থাকে তাহলেও মহান আল্লাহ্ ঐ দিবসকে এতটা দীর্ঘায়িত করবেন যাতে তিনি ঐ দিবসেই আমার আহ্‌লে বাইতের মধ্য থেকে এক ব্যক্তির শাসনকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করে দিতে পারেন যাকে আমার নামেই ডাকা হবে। পৃথিবী অন্যায়-অত্যাচারে ভরে যাওয়ার পর সে তা শান্তি ও ন্যায়ে পূর্ণ করে দেবে।'– তিরমিযী ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৬, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৭৪-৭৫; আবু দাউদ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭; মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বল, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৬, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬৩; মুস্তাদরাকুস্ সাহীহাইন (হাকেম), ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৫৭; আল মাজমা (তাবরানী), পৃ. ২১৭; তাহযীবুস্ সাবিত (ইবনে হাজার আসকালানী), ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৪৪; আস সাওয়ায়িকুল মুহ্‌রিকাহ্ (ইবনে হাজার হাইসামী), ১১শ অধ্যায়, উপাধ্যায় ১, পৃ. ২৪৯; কানযুল উম্মাল, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৮৬; ইকদুদ দুরার ফী আখবারিল মাহ্‌দী আল মুনতাযার,

১২শ খণ্ড, ১ম অধ্যায়; আল বায়ান ফী আখবারি সাহিবিয যামান (গাঞ্জী শাফিয়ী), ১২শ অধ্যায়; ফাতহুল বারী (ইবনে হাজার আসকালানী), ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩০৫; আল তাযকিরাহ্ (কুরতুবী), পৃ. ৬১৭; আল হাভী (সুয়ূতী), ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৫-১৬৬; শারহুল মাওয়াহিবুল লাদুন্নীয়াহ্ (যুরকানী), ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৮; ফাতহুল মুগীস (সাখাভী), ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪১; আরজাহুল মাতালিব (উবায়দুল্লাহ্ হিন্দী), পৃ. ৩৮০; আল মুকাদ্দিমাহ্ (ইবনে খালদুন), পৃ. ২৬৬; জামিউস সাগীর (সুয়ূতী), পৃ. ১৬০; আল উরফুল ওয়ারদী (সুয়ূতী), পৃ. ২ ।

আশ শাফিয়ী (ওফাত ৩৬৩/৯৭৪) বলেছেন যে, এ হাদীস বিপুল সংখ্যক সূত্রে বর্ণিত এবং বহু সংখ্যক বর্ণনাকারী কর্তৃক তা মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র বর্ণিত ও প্রচারিত হয়েছে । এছাড়া হাদীসটি ইবনে হিব্বান, আবু না'ঈম, ইবনে আসাকির প্রমুখ কর্তৃক লিখিত গ্রন্থাদিতেও উদ্ধৃত হয়েছে ।

২. রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন : 'মাহ্দী ফাতিমার বংশধর ।' (ইবনে মাজাহ্, ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৪০৮৬; নাসাঈ; বাইহাকী; আস সাওয়ায়িকুল মুহ্রিকাহ্, অধ্যায় ১১, উপাধ্যায় ১, পৃ. ২৪৯ এর বর্ণনানুসারে অন্যান্য হাদীস সংকলকগণ) ।

৩. মহানবী (সা.) বলেছেন : 'আমরা আবদুল মুত্তালিবের বংশধরগণ বেহেশতবাসীদের নেতা : স্বয়ং আমি, হামযাহ্, আলী, জাফর, হাসান, হুসাইন এবং মাহ্দী ।' (ইবনে মাজাহ্, ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৪০৮৭; মুস্তাদরাকে হাকেম (আনাস ইবনে মালিক-এর সূত্রে বর্ণিত); দাইলামী; আস সাওয়ায়িকুল মুহরিকাহ্, অধ্যায় ১১, উপাধ্যায় ১, পৃ. ২৪৫)

৪. মহানবী (সা.) বলেছেন : 'আমার ও আমার আহ্লে বাইতের সদস্যদের জন্য আল্লাহ্ পারলৌকিক জীবনকে ইহলৌকিক জীবনের ওপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন ও মনোনীত করেছেন । আমার (ওফাতের) পরে আমার আহ্লে বাইতের সদস্যরা অনেক কষ্ট ভোগ করবে এবং তাদেরকে ঘর-বাড়ি থেকে বলপূর্বক উচ্ছেদ করা হবে । তখন প্রাচ্য থেকে একদল লোক কালো পতাকাসহ আগমন করবে এবং তাদেরকে কিছু ভাল জিনিস (অধিকার) প্রদান করার জন্য তারা আবেদন করবে । কিন্তু তারা প্রত্যাখ্যাত হবে অর্থাৎ তাদেরকে সেই অধিকার দেয়া হবে না । এ কারণে তারা যুদ্ধ শুরু করবে । সে যুদ্ধে তারা বিজয়ী হবে এবং তারা যা প্রথমে চেয়েছিল তা-ই তাদেরকে দেয়া হবে । কিন্তু তারা তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করবে যতক্ষণ না

আমার আহ্‌লে বাইত থেকে এক ব্যক্তি আবির্ভূত হবে এবং যেভাবে পৃথিবী অন্যায়-অবিচারে পূর্ণ হয়ে যাবে ঠিক সেভাবে তা ন্যায় ও সুবিচার দিয়ে পূর্ণ করে দেবে। তাই যে ব্যক্তি ঐ যুগ প্রত্যক্ষ করবে তার উচিত হবে বরফের ওপর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তাদের সাথে মিলিত হওয়া।' (ইবনে মাজাহ্‌, ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৪০৮২; তারিখে তাবারী; আস সাওয়ায়িকুল মুহ্‌রিকাহ্‌, অধ্যায় ১১, উপাধ্যায় ১, পৃ. ২৫০-২৫১)

৫. রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.) বলেছেন : 'মাহ্‌দী আমার আহ্‌লে বাইত থেকে আবির্ভূত হয়ে একটি বিপ্লব ঘটাবে এবং পৃথিবী অন্যায়-অবিচার ও অত্যাচারে পরিপূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর তাকে ন্যায় ও সাম্য দ্বারা পূর্ণ করে দেবে।' (মুসনাদে আহমাদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৪; জামিউস সাগীর, পৃ. ২ ও ১৬০; আল উরফুল ওয়ার্দী, পৃ. ২; কানযুল উম্মাল, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৮৬; ইকদুদ দুরার, ১২শ খণ্ড, অধ্যায় ১; আল বায়ান ফী আখবারি সাহিবিয যামান, ১২শ অধ্যায়; আল ফুসুসুল মুহিম্মাহ্‌, ১২শ অধ্যায়; আরজাহুল মাতালিব, পৃ. ৩৮০; আল মুকাদ্দিমাহ্‌, পৃ. ২৬৬)

৬. মহানবী (সা.) বলেছেন : 'আল্লাহ্‌ শেষ বিচার দিবসের আগে, এমনকি এ পৃথিবীর আয়ুষ্কাল যদি একদিনও অবশিষ্ট থাকে, আমার আহ্‌লে বাইতের মধ্য থেকে মাহ্‌দীকে অন্তর্ধান থেকে আবির্ভূত করবেন। সে এ পৃথিবীতে ন্যায় ও সুবিচারের প্রসার ঘটাবে এবং সব ধরনের অন্যায়, অত্যাচার ও অবিচারের মূলোৎপাটন করবে।' (মুসনাদে আহ্‌মাদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৯)

সুনানে আবু দাউদেও উপরিউক্ত হাদীসের অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। (ইংরেজি অনুবাদ, অধ্যায় ৩৬, হাদীস নং ৪২৭০)

৭. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্‌ আল আনসারী (রা.) বলেছেন : 'আমি রাসূলুল্লাহ্‌কে বলতে শুনেছি : আমার উম্মাহ্‌র একদল ব্যক্তি শেষ বিচার দিবসের কাছাকাছি সময় পর্যন্ত সত্যের জন্য যুদ্ধ করতে থাকবে। তখন ঈসা ইবনে মারইয়াম অবতরণ করবেন এবং তাদের নেতা (মাহ্‌দী) তাঁকে নামায পড়ানোর জন্য অনুরোধ করবে; কিন্তু ঈসা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে বলবেন : না, আপনাদেরকে মহান আল্লাহ্‌ অন্যদের (সমগ্র মানব জাতির) জন্য নেতা মনোনীত করেছেন।' (মুসলিম, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯৩; মুসনাদে আহমাদ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৫ ও ৩৮৪; আস সাওয়ায়িকুল মুহ্‌রিকাহ্‌, অধ্যায়

১১, উপাধ্যায় ১, পৃ. ২৫১; সুয়ূতী প্রণীত নুযূল ঈসা ইবনে মারইয়াম আখিরায যামান)

৮. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ বলেছেন : 'রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন : আমার উম্মতের মধ্য থেকে একদল লোক ঈসা ইবনে মারইয়ামের অবতরণ পর্যন্ত সত্যের জন্য যুদ্ধ করতে থাকবে। ঈসা ইবনে মারইয়াম অবতরণ করলে তাদের ইমাম (মাহ্দী) তাঁকে নামায পড়ানোর জন্য অনুরোধ করবে। কিন্তু ঈসা বলবেন : এ কাজ করার জন্য আপনি অধিক হকদার। আর মহান আল্লাহ্ এ উম্মতে আপনাদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে অন্যদের ওপর মর্যাদা দিয়েছেন।' (মুসনাদে আবু ইয়ালা; সহীহ্ ইবনে হিব্বান)

মনীষীদের অভিমত

ইবনে আবী শাইবাহ্ (আহ্লে সুন্নাতের প্রসিদ্ধ হাদীসশাস্ত্রবিদ এবং সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমের ব্যাখ্যাকার) ইমাম মাহ্দী (আ.) সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন যাতে বলা হয়েছে যে, ইমাম– যিনি নামাযে হযরত ঈসা ইবনে মারইয়ামেরও ইমাম হবেন তিনি মাহ্দী (আ.)।

সুয়ূতী উল্লেখ করেছেন : 'হযরত ঈসা (আ.) যখন অবতরণ করবেন তখন ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর পিছনে নামায পড়বেন– এতদসংক্রান্ত হাদীসসমূহ যে সব ব্যক্তি অস্বীকার করেছে তাদের মধ্য থেকে কতিপয় ব্যক্তিকে আমি সত্য অস্বীকার করে বলতে শুনেছি : এমন ব্যক্তি যিনি নবী নন, তাঁর পিছনে নামায পড়া অপেক্ষা ঈসা (আ.)-এর মর্যাদা উচ্চতর।' কিন্তু পরম সত্যবাদী মহানবী (সা.)-এর নিকট থেকে বহু সংখ্যক সহীহ্ হাদীসের মাধ্যমে ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর পিছনে হযরত ঈসা ইবনে মারইয়ামের নামায পড়ার বিষয়টি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এটি একটি অদ্ভুত অভিমত।'

আল্লামা সুয়ূতী এ ব্যাপারে বেশ কিছু হাদীস বর্ণনা করেছেন। (নুযূলু ঈসা ইবনে মারইয়াম আখিরায যামান)

ইবনে হাজার আসকালানী বলেছেন : 'মাহ্দী এ উম্মতেরই একজন। হযরত ঈসা অবতরণ করে তাঁর পিছনে নামায পড়বেন।' (ফাতহুল বারী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৬২)

আহ্‌লে সুন্নাতের আরেক বিখ্যাত আলেম ইবনে হাজার হাইসামীও একই কথা উল্লেখ করে বলেছেন : 'আহ্‌লে বাইত আকাশের তারকারাজির ন্যায় যাদের মাধ্যমে আমরা সঠিক দিকে পরিচালিত হই এবং তারকারাজি যদি অস্ত যায় (ঢাকা পড়ে যায়) তাহলে আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আমরা কিয়ামত দিবসের নিদর্শনাদির মুখোমুখি হব। আর হাদীস অনুযায়ী এটি তখনই ঘটবে যখন ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর আগমন হবে, নবী হযরত ঈসা (আ.) তাঁর পিছনে নামায পড়বেন এবং দাজ্জালকে হত্যা করা হবে। আর তখনই সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহ একের পর এক প্রকাশ পেতে থাকবে।' (আস সাওয়ায়িকুল মুহ্‌রিকাহ্‌, অধ্যায় ১১, উপাধ্যায় ১, পৃ. ২৩৪)

আবুল হুসাইন আল আজীরীর উদ্ধৃতি দিয়ে ইবনে হাজার বলেছেন : 'ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর আবির্ভাব ও উত্থান সম্পর্কিত রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর হাদীসসমূহ বিপুল সংখ্যক সনদসহ বর্ণিত হয়েছে এবং তা মুতাওয়াতির হওয়ার পর্যায়কেও ছাড়িয়ে গেছে। এসব হাদীসে মহানবী (সা.)-এর নিকট থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, মাহ্‌দী তাঁর (রাসূলুল্লাহ্‌র) আহ্‌লে বাইতভুক্ত হবেন, তিনি পৃথিবীকে ন্যায় ও সুবিচার দিয়ে পূর্ণ করে দেবেন এবং হযরত ঈসা মসীহ্‌ (আ.)ও ঐ একই সময় আগমন করবেন। মাহ্‌দী ফিলিস্তিনে দাজ্জালকে হত্যা করার ব্যাপারে ঈসা (আ.)-কে সাহায্য করবেন। তিনি এ উম্মতের নেতৃত্ব দেবেন এবং হযরত ঈসা (আ.) তাঁর পিছনে নামায পড়বেন।' (আস সাওয়ায়িকুল মুহ্‌রিকাহ্‌, অধ্যায় ১১, উপাধ্যায় ১, পৃ. ২৫৪)

ইবনে আলী আশ শাওকানী (ওফাত ১২৫০/১৮৩৪) 'আত তাওদীহ ফী তাওয়াতুরি মা জাআ ফীল মুনতাযার্‌ ওয়াদ দাজ্জাল ওয়াল মাসীহ্‌' (প্রতীক্ষিত ইমাম মাহ্‌দী, দাজ্জাল ও মসীহ্‌ সংক্রান্ত হাদীসসমূহ মুতাওয়াতির হওয়ার ব্যাপারে ব্যাখ্যা) নামক গ্রন্থে ইমাম মাহ্‌দী সম্পর্কে লিখেছেন : 'মাহ্‌দী সংক্রান্ত হাদীসসমূহ বহু নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত হয়েছে এবং এ কারণেই এসব হাদীস নিঃসন্দেহে নির্ভরযোগ্য; কারণ, ফিকাহ্‌শাস্ত্রে ঐ সব হাদীসের ক্ষেত্রেও মুতাওয়াতির হওয়ার বৈশিষ্ট্য প্রযোজ্য যেগুলো ইমাম মাহ্‌দী সংক্রান্ত হাদীসসমূহের সংখ্যার চেয়েও অল্প সংখ্যায় বর্ণিত হয়েছে। মহানবীর সাহাবীদের প্রচুর বাণী আছে যেগুলোতে স্পষ্টভাবে ও বিশদভাবে মাহ্‌দী (আ.) সংক্রান্ত আলোচনা বিদ্যমান। এসব বাণী মাহনবী (সা.)-এর নিকট থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহের সমপর্যায়ভুক্ত। কারণ, ইজতিহাদের মাধ্যমে এসব বাণী প্রতিষ্ঠিত করায় কোন সমস্যা নেই।' লেখক 'আল ফাতহুর রাব্বানী' নামক তাঁর

অপর এক গ্রন্থেও একই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। (এতদসংক্রান্ত বিষয়ে দেখুন মাওযূআতুল ইমাম আল মাহ্দী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯১-৩৯২, ৪১৩-৪১৪ ও ৪৩৪ এবং তুহাফুল আহ্ওয়াযী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪৮৫)

আস সাবান তাঁর ইসআফুর রাগিবীন গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন : 'ইমাম মাহ্দীর আবির্ভাব সংক্রান্ত হাদীসসমূহ যে মহানবী (সা.) কর্তৃক বর্ণিত তা বোঝা যায়। তিনি (মাহ্দী) মহানবীর আহ্লে বাইতের সদস্য এবং তিনি পৃথিবীকে ন্যায় ও সুবিচার দিয়ে পূর্ণ করে দেবেন।'

সুয়ূতী তাঁর সাবাইকুয যাহাব গ্রন্থে বলেছেন : 'আলেমগণ ঐকমত্য পোষণ করেন যে, মাহ্দী শেষ যুগে আবির্ভূত হয়ে সমগ্র বিশ্বকে ন্যায় ও সুবিচার দিয়ে পূর্ণ করে দেবেন। তাঁর আবির্ভাব সংক্রান্ত হাদীস বিপুল সংখ্যক।'

হাফেয আবুল হাসান সিজিস্তানী (ওফাত ৩৬৩ হি./ ৯৭৪ খ্রি.) বলেছেন : 'মহানবী (সা.)-এর নিকট থেকে ইমাম মাহ্দী (আ.) সংক্রান্ত হাদীসসমূহ বিপুল সংখ্যক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। মাহ্দী (আ.) মহানবী (সা.)-এর আহ্লে বাইতভুক্ত হবেন এবং সমগ্র বিশ্বকে ন্যায় ও সুবিচার দিয়ে পূর্ণ করে দেবেন।'

পরবর্তী যেসব খ্যাতনামা আলেম এ বক্তব্য মেনে নিয়েছেন তাঁদের মধ্যে আছেন ইবনে হাজার আসকালানী (তাহ্যীবুত তাহ্যীব, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৪৪, ফাতহুল বারী, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩০৫), কুরতুবী (আত তাযকিরাহ্, পৃ. ৬১৭), সুয়ূতী (আল হাভী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৫-১৬৬), মুত্তাকী হিন্দী (আল বুরহান ফী আলামাতি মাহ্দীয়ে আখিরিয যামান, পৃ. ১৭৫-১৭৬), ইবনে হাজার হাইসামী (আস সাওয়ায়িকুল মুহ্রিকাহ্, অধ্যায় ১১, উপাধ্যায় ১, পৃ. ২৪৯), যুরকানী (শারহুল মাওয়াহিবুল লাদুন্নীয়াহ্, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৮), সাখাভী (ফাতহুল মুগীস, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪১)

দু'জন বিখ্যাত শাফেয়ী আলেম আল্লামা গাঞ্জী তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'আল বায়ান'-এ এবং শাবলানজী তাঁর গ্রন্থ 'নুরুল আবসার'-এ 'তিনিই সেই সত্তা, যিনি তাঁর রাসূলকে হেদায়াত ও সত্য দীনসহ প্রেরণ করেছেন যাতে তিনি তা সকল ধর্মের ওপর বিজয়ী করে দেন'– কুরআন মাজীদের এ আয়াতের ব্যাপারে সাঈদ ইবনে জুবাইর থেকে বর্ণনা করেছেন যে, মহানবী (সা.)-এর প্রতি মহান আল্লাহ্র এ প্রতিশ্রুতি আল মাহ্দীর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে যিনি হযরত ফাতিমার বংশধর।

ইবনে তাইমীয়াহ্ (ওফাত ৭২৮ হি./১৩২৮ খ্রি.) তাঁর গ্রন্থ 'মিনহাজুস সুন্নাহ্'য় (৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২১১-২১২) লিখেছেন যে, ইমাম মাহ্‌দী সংক্রান্ত হাদীসসমূহ অবশ্যই নির্ভরযোগ্য। আর তাঁর শিষ্য যাহাবী তাঁর শিক্ষকের এ গ্রন্থের সার সংক্ষেপে এ বিষয়টি স্বীকার করেছেন। (মুখতাসার মিনহাজুস সুন্নাহ্, পৃ. ৫৩৩-৫৩৪)

রাবেতায়ে আলমে ইসলামী কর্তৃক ১১ অক্টোবর ১৯৭৬ তারিখে প্রদত্ত এক ফতোয়ায় বলা হয়েছে যে, ২০ জনেরও অধিক সাহাবী ইমাম মাহ্‌দী (আ.) সংক্রান্ত এসব হাদীস বর্ণনা করেছেন। এছাড়া যে হাদীসশাস্ত্রবিদগণ এসব হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং যাঁরা ইমাম মাহ্‌দীর ওপর বই-পুস্তক লিখেছেন তাঁদের একটি তালিকাও এ ফতোয়ার সাথে প্রদান করা হয়েছে। এ ফতোয়ায় বলা হয়েছে : হাদীসের হাফেজ এবং হাদীসশাস্ত্র বিশারদগণ প্রত্যয়ন করেছেন যে, ইমাম মাহ্‌দী সংক্রান্ত হাদীসসমূহের মধ্যে অনেক সহীহ এবং হাসান হাদীস বিদ্যমান। এর অধিকাংশ হাদীসই বিপুল সংখ্যক সূত্রে বর্ণিত (অর্থাৎ মুতাওয়াতির বা অকাট্য)। তাঁরা আরও প্রত্যয়ন করেছেন যে, মাহ্‌দীর আগমনে বিশ্বাস স্থাপন ফরয এবং এটি হচ্ছে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকীদার অন্যতম। সুন্নী মাজহাবের কেবল অজ্ঞ ব্যক্তিরা ও বিদআতপন্থীরা মাহ্‌দী সংক্রান্ত আকীদা অস্বীকার করেছেন। (এ ফতোয়ার পূর্ণ পাঠের জন্য আল বায়ান গ্রন্থের লেখক আল গাঞ্জী আশ শাফেয়ীর ভূমিকা দেখুন, বৈরুত ১৩৯৯ হি./ ১৯৭৯ খ্রি., পৃ. ৭৬-৭৯)

আহ্‌লে সুন্নাতের বিশিষ্ট আলেম শেখ খাজা মুহাম্মদ পার্সা নাকশবন্দীর বক্তব্য : 'আবু মুহাম্মাদ হাসান আসকারী (আ.) আহ্‌লে বাইতের অন্তর্ভুক্ত। তিনি ৬ রবিউল আওয়াল ২৬০ হি. শুক্রবার ইন্তেকাল করেন এবং তাঁকে তাঁর পিতার সমাধির কাছে সমাহিত করা হয়। তিনি তাঁর পিতার ইন্তেকালের পর ৬ বছর জীবিত ছিলেন এবং (মৃত্যুকালে) কেবল এক পুত্রসন্তান রেখে যান যিনি হচ্ছেন আবুল কাসেম মুহাম্মাদ (আ.)। তিনিই প্রতীক্ষিত ত্রাণকর্তা। প্রতীক্ষিত ত্রাণকর্তা ২৫৫ হিজরির ১৫ শাবান জন্মগ্রহণ করেন; তাঁর মায়ের নাম ছিল নারজিস (রা.)। যাখন তাঁর বয়স ৫ বছর তখন তাঁর পিতা ইমাম হাসান আসকারী (আ.) ইন্তেকাল করেন।'

শেখ ওয়াহাব ইবনে আহমাদ ইবনে আলীর বক্তব্য : 'কিয়ামতের শর্তাবলীর অন্যতম ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর পুনরাবির্ভাব, দাজ্জালের আবির্ভাব, আকস্মিক নতুন নতুন রোগের প্রাদুর্ভাব, পশ্চিম দিক হতে সূর্যোদয়, কুরআন উধাও হয়ে যাওয়া, ইয়াজুজ-

মাজুজের আবির্ভাব ও বিজয়।' এরপর তিনি বলেন : 'এসব ঘটনা ঘটবে এবং ঐ সময় ঘটবে যখন ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর পুনরাবির্ভাবের প্রত্যাশা করা হবে, যিনি হবেন ইমাম হাসান আসকারী (আ.)-এর পুত্র এবং ২৫৫ হিজরির ১৫ শাবান জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি এখনও জীবিত আছেন এবং ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ.)-এর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হবে।' (আল ইয়াওয়াকীত ওয়াল জাওয়াহির ফী আকাইদুল আকবার, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ১২৭)

আহলে সুন্নাতের বিশিষ্ট মনীষী ইমাম ইবনে জাওযীর বক্তব্য : 'মুহাম্মাদ ইবনে হাসান বিন আলী বিন মুহাম্মাদ বিন আলী বিন মূসা বিন জাফর বিন মুহাম্মাদ বিন আলী বিন হুসাইন ইবনে আলী ইবনে আবী তালিব (আ.)। আবুল কাসিম আপনার উপাধি এবং আপনি খলিফা ও সকল যুগের ইমাম। আপনার মায়ের নাম সাকীল।' (তাযকিরাতুল খাওয়াস, পৃ. ২০৪, মিশর থেকে প্রকাশিত)।

'গ্রান্ড মুফতিয়ে দিয়ার' (দেশের সর্বপ্রধান মুফতি) নামে খ্যাত আল হাযারমা আবদুর রহমান বিন মুহাম্মাদ ইবনে হুসাইন ইবনে উমর আল মসহুর আলাভীর বক্তব্য : 'শেখ ইরাকীর মতে, ইমাম মাহ্দী (আ.) ২৫৫ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। শেখ আলী আল খাওয়াসের জীবদ্দশায় অর্থাৎ ৯৫৮ হিজরিতে ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর বয়স ৭০৩ বছর হয়ে থাকবে। আহমদ রামলীও বলেছেন যে, ইমাম মাহ্দী (আ.) সত্য (বাস্তবে বিদ্যমান); আর ঠিক একই কথা ইমাম আবদুল ওয়াহাব শারানীও বলেছেন।' (বাকীয়াতুল মুস্তারশিদীন, পৃ. ২৯৪, বৈরুত থেকে প্রকাশিত)

'ইমাম কিরমানী' নামে প্রসিদ্ধ আহমদ ইবনে ইউসুফ ওয়া মুশকীর বক্তব্য : 'পিতার মৃত্যুর সময় ইমাম আবুল কাসেম মুহাম্মাদ ইবনে হাসান আসকারীর বয়স ছিল ৫ বছর। মহান আল্লাহ্ যেমন নবী হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ.)-কে ঐ বয়সে জ্ঞান দিয়েছিলেন যখন তিনি ছিলেন অতি অল্প বয়স্ক শিশু, ঠিক তেমনি তিনি তাঁকে ঐ অল্প বয়সেই ঐশী ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দিয়েছিলেন। তিনি সুন্দর আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন এবং তাঁর পবিত্র বদনমণ্ডল ছিল আলোকিত (নূরানী)।' (এসব বৈশিষ্ট্যই ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর বিবরণ প্রদানকালে হাদীসের গ্রন্থাবলীতেও উল্লিখিত হয়েছে। তারিখে আখবারুদ দুওয়াল ফী আছারিল আউয়াল, পৃ. ১১৮, বাগদাদ, ইরাক থেকে প্রকাশিত)।

আহলে সুন্নাতের আরেক মনীষী ইমাম আল্লামা শেখ আবদুল্লাহ্‌ বিন মুহাম্মাদ বিন আমীর আশ শিবরাভীর বক্তব্য : 'প্রতীক্ষিত ত্রাণকর্তা ইমাম মাহ্‌দী ইবনে হাসান আল খালিস (আ.) ২৫৫ হিজরির ১৫ শাবান সামাররায় জন্মগ্রহণ করেন। আব্বাসী শাসনকর্তার অত্যাচার ও নির্যাতনের কারণে ইমাম হাসান আসকারী মৃত্যুর পাঁচ বছর আগে ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর জন্মগ্রহণের বিষয়টি গোপন রেখেছিলেন। ইমাম মুহাম্মাদের উপাধিগুলো হচ্ছে মাহ্‌দী, কায়েম, মুনতাযার (প্রতীক্ষিত), খালাফে সালেহ্‌ (পুণ্যবান উত্তরাধিকারী) এবং সাহেবুয যামান; এসব উপাধির মধ্যে আল মাহ্‌দী সবচেয়ে প্রসিদ্ধ।' (ইলা তাহাফি বিহুবিল আশরাফ, পৃ. ১৭৯-১৮০, মিশর থেকে প্রকাশিত)।

আহলে সুন্নাতের আরেক মনীষী ইমাম আল্লামা আল হাফেয মুহাম্মাদ বিন মুতামাদ খান আর বাদাখশানী। 'নিশ্চয়ই আপনার শত্রু হবে নির্বংশ'–এ আয়াতের আবতার শব্দের ব্যাখ্যা করে বলেন : আবতার ঐ ব্যক্তি যার কোন ভবিষ্যতে আশা-আকাঙ্ক্ষা বা ভবিষ্যৎ বংশধারা নেই। অতঃপর তিনি বলেন : 'ইমাম হুসাইনের পুত্র আবুল হাসান আলী বিন হুসাইন যায়নুল আবেদীন (আ.), তাঁর পুত্র আবু জাফর মুহাম্মাদ আল বাকের (আ.), তাঁর সন্তান আবু আবদিল্লাহ্‌ জাফর আস সাদেক (আ.), তাঁর সন্তান আবু ইসমাঈল মূসা আল কাযেম (আ.), তাঁর সন্তান আবুল হাসান আলী আর রেযা (আ.), তাঁর সন্তান আবু জাফর মুহাম্মাদ আল জাওয়াদ (আ.), তাঁর সন্তান ছিলেন আবুল হাসান আলী আল হাদী (আ.) এবং তাঁর সন্তান ছিলেন আবু মুহাম্মাদ আয যাকী (আ.); আর তাঁর সন্তান হচ্ছেন আল মুনতাযার আবুল কাসেম মুহাম্মাদ আল মাহ্‌দী (আ.)।' (নাযালুল আবরার, পৃ. ১৭৪-১৭৫; ইরাক থেকে মুদ্রিত)

আহলে সুন্নাতের বিশিষ্ট মনীষী আল্লামা কামালুদ্দীন মুহাম্মদ বিন তালহা শাফিয়ীর বক্তব্য : 'আবুল কাসেম মুহাম্মদ বিন আল হাসান আল খালিস বিন আলী আল মুতাওয়াক্কিল বিন মুহাম্মদ আল কামিয়াহ্‌ বিন আলী আর রেযা বিন মূসা আল কাযেম বিন জাফর আস সাদেক বিন মুহাম্মদ আল বাকের বিন আলী যয়নুল আবেদীন বিন হুসাইন আয যাকী বিন আলী বিন আবী তালিব (আ.); তিনি প্রতীক্ষিত ত্রাণকর্তা। তাঁর মায়ের নাম ছিল সাকীলাহ্‌ এবং তিনি হাকীমাহ্‌ নামেও পরিচিতা ছিলেন। তাঁর নাম মুহাম্মদ; তাঁর কুনিয়াত আবুল কাসেম; তাঁর উপাধিসমূহের মধ্যে আল হুজ্জাত, খালাফে সালেহ্‌ ও আল মুনতাযার প্রসিদ্ধ।' (মাতালিবুস সুউল ফী মানাকিবে আলে রাসূল, পৃ. ৮৯; মিশর থেকে প্রকাশিত।

তিনি উক্ত গ্রন্থে আরও লিখেছেন যে, ইমাম মাহ্দী (আ.) ইমাম আবু মুহাম্মাদ আল হাসান আল আসকারীর পুত্র। তিনি সামাররায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি (গ্রন্থকার) তাঁর আদ দুরারুল মুনাযযাম গ্রন্থেও একই কথা উল্লেখ করেছেন।

আহলে সুন্নাতের প্রখ্যাত আলেম শেখ আসলাহুদ্দীন তাঁর শারহে দায়িরাহ্ গ্রন্থে লিখেছেন যে, হযরত মাহ্দী (আ.) আহলে বাইতের ইমামদের মধ্যে দ্বাদশ ইমাম। ইমাম আলী ছিলেন প্রথম ইমাম এবং ইমাম মাহ্দী হচ্ছেন সর্বশেষ ইমাম।

আহলে সুন্নাতের অন্তত পঁয়ত্রিশ জন বিখ্যাত আলেম ইমাম মাহ্দী (আ.) সম্পর্কে ৪৬টি গ্রন্থ রচনা করেছেন। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

১. কিতাবুল মাহ্দী : আবু দাউদ
২. আলামাতুল মাহ্দী : জালালুদ্দীন সুয়ূতী।
৩. আল কাওলুল মুখতাসার ফী আলামাতিল মাহ্দী আল মুনতাযার : ইবনে হাজার।
৪. আল বায়ান ফী আখবারি সাহিবিয যামান : আল্লামা আবু আবদিল্লাহ্ ইবনে মুহাম্মাদ ইউসুফ আদ দামেশকী।
৫. মাহ্দী আলে রাসূল : আলী ইবনে সুলতান মুহাম্মাদ আল হিরাভী আল হানাফী।
৭. মানাকিবুল মাহ্দী : আল হাফেয আবু নাঈম আল ইসফাহানী
৮. আল বুরহান ফী আলামাতিল মাহ্দী আখিরায যামান : মুত্তাকী আল হিন্দী।
৯. আরবাউনা হাদীসান ফীল মাহ্দী : আবদুল আলা আল হামাদানী।
১০. আখবারুল মাহ্দী : আল হাফেয আবু নুআইস।

(সূত্র : তেহরান, ইরান থেকে প্রকাশিত আল তাওহীদ, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০০৩ সংখ্যা থেকে সংকলিত।)

নীতিবিজ্ঞান

নীতি-নৈতিকতা সম্পর্কিত কতিপয় বিষয়

নীতি-নৈতিকতা সম্পর্কিত কতিপয় বিষয়

সংকলন : মো. আশিফুর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সত্যবাদিতা

মানব সমাজের সদস্যদের মধ্যে বিদ্যমান পারস্পরিক সম্পর্কই হচ্ছে মানব সমাজের ভিত্তি। এ সম্পর্ক পরস্পর কথা বলার মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হয়। আর সত্য কথা মানুষের কাছে প্রকৃত তথ্য প্রকাশ করে থাকে।

সত্যবাদিতা মুমিনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'মুমিন কি কখনও ভীতু হয়?' তিনি বললেন : 'হ্যাঁ, হতে পারে।' আবার জিজ্ঞাসা করা হল : 'মুমিন কি কখনও কৃপণ হয়?' তিনি বললেন : 'হ্যাঁ, হতে পারে।' তাঁকে আবার জিজ্ঞাসা করা হল : 'মুমিন কি কখনও মিথ্যাবাদী হয়?' তিনি বললেন : 'না।'[১]

ইমাম জাফর সাদিক (আ.) বলেছেন : 'কোন পুরুষের লম্বা সিজদাহ্ ও রুকুর প্রতি লক্ষ্য কর না; কারণ, এটা সে অভ্যাসে পরিণত করে ফেলেছে, যদি তা সে ছেড়ে দেয় তাহলে অস্বস্তি বোধ করে, তোমরা তাকাও তার সত্যবাদিতা ও আমানতদারীর দিকে।'

পবিত্র কুরআনে সত্যবাদীদের সঙ্গী হবার আদেশ দেয়া হয়েছে। সূরা তওবার ১১৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿١١٩﴾

'হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং (সর্বদা) সত্যবাদীদের সঙ্গে থাক।'

আর সত্যবাদীদেরই কিয়ামতে সৌভাগ্যের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। সূরা মায়েদার ১১৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে :

قَالَ ٱللَّهُ هَٰذَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّٰدِقِينَ صِدْقُهُمْ ۚ لَهُمْ جَنَّٰتٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا
ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۚ رَّضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿١١٩﴾

আল্লাহ বলবেন, 'এই সেই দিন, যেদিন সত্যবাদীদের সত্যভাষণ কাজে আসবে; তাদের জন্য রয়েছে উদ্যানসমূহ যার নিম্নদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত, আর তারা সেখানে অনন্তকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট, এটাই তো মহা সাফল্য।'

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন : 'নিশ্চয়ই সত্যবাদিতা মানুষকে পুণ্যের পথ দেখায় এবং পুণ্য জান্নাতের দিকে পরিচালিত করে। আর মানুষ সত্য বলতে বলতে শেষ পর্যন্ত সিদ্দীক (পরম সত্যবাদী) হয়ে যায়। আর মিথ্যা মানুষকে পাপ কার্যের পথ দেখায় এবং পাপকার্য জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। মানুষ মিথ্যা বলতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্র নিকট জঘন্য মিথ্যাবাদী হিসাবে তার নাম লিপিবদ্ধ হয়ে যায়।'[২]

মহানবী (সা.) বলেন : 'আমার নিকট থেকে ছয়টি বিষয় গ্রহণ করতে সম্মত হও, তাহলে আমি তোমার বেহেশতে প্রবেশের বিষয়ে সম্মত হব (নিশ্চয়তা দেব) :

১. কথা বলার সময় মিথ্যা বল না;
২. ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ কর না;
৩. যখন তুমি (অন্যের নিকট) বিশ্বস্ত, তখন সততা বজায় রেখ;
৪. তোমার দৃষ্টিকে অবনত কর (পাপ কাজ থেকে);
৫. তোমার লজ্জাশীলতা ও ভদ্রতাকে সংরক্ষণ কর;
৬. তোমার হাত ও জিহ্বাকে সংযত কর।'[৩]

সত্যবাদিতার উপকারিতা

১. সত্যবাদী ব্যক্তি তার সাথীদের আস্থাভাজন হয়ে থাকে এবং তার প্রতিটি বাক্যই তাদেরকে তৃপ্তি দান করে।

২. সত্যবাদী ব্যক্তি তার বিবেকের সামনে সমুন্নত এবং মিথ্যার অশান্তি থেকে মুক্ত।

৩. সত্যবাদী তার ওয়াদা পালন করে থাকে এবং আমানতের খেয়ানত করে না।

৪. সত্যবাদিতার মাধ্যমে মতপার্থক্য ও মতবিরোধ দূরীভূত হয়ে যায়। কেননা, অধিকাংশ মতবিরোধ ও ঝগড়া-বিবাদ এ কারণে সংঘটিত হয়ে থাকে যে, কোন এক পক্ষ অথবা উভয় পক্ষ সত্যকে স্বীকৃতি দান থেকে বিরত থাকে বা তার বিপরীত আচরণ করে থাকে।

৫. সত্যবাদিতার ফলে চারিত্রিক দোষসমূহ ও আইন লঙ্ঘনের একটি বিরাট অংশ নিজে নিজেই দূরীভূত হয়ে যায়। কেননা, অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষ এসব খারাপ কাজ ও আচরণ ঢাকার জন্য মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে থাকে।

মিথ্যা কথা বলা

মিথ্যা বলা বা সত্যের বিপরীত যে কোন কথা হল কুৎসিত এবং তা বর্জনীয়। আর এটা শয়তানের অন্যতম ধারালো অস্ত্র। মিথ্যা বলা কবীরা গুনাহ। মিথ্যাবাদী হচ্ছে মানব সমাজের বড় দুশমন।

মিথ্যাবাদীদের সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেছেন :

إِنَّمَا يَفْتَرِى ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ ۖ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَـٰذِبُونَ ﴿١٠٥﴾

'নিশ্চয় তারাই মিথ্যা আরোপ করে যারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহে বিশ্বাস করে না; এবং প্রকৃতপক্ষে তারাই হল মিথ্যাবাদী।'[৪]

মহানবী (সা.) বলেছেন : 'কপটতার দরজাসমূহের একটি দরজা হল মিথ্যা।'[৫]

মহানবী (সা.) আরও বলেন : 'এটি একটি বড় বিশ্বাসঘাতকতা যে, তুমি তোমার ভাইয়ের সাথে কথা বল এবং সে তোমাকে বিশ্বাস করে, অথচ তুমি তাকে মিথ্যা বলছ।'[৬]

মহানবী (সা.) বলেছেন : 'মিথ্যা হতে দূরে থাক। কারণ, মিথ্যা ঈমান থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।'[৭]

ইমাম আলী (আ.) বলেছেন : 'মানুষ ঈমানের স্বাদ গ্রহণ করতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে মিথ্যাকে পরিহার করতে পারে স্বাভাবিক অবস্থায়, এমনকি কৌতুকরত অবস্থায়।'

ইমাম সাজ্জাদ (আ.) স্বীয় পুত্রকে বলেন : 'ছোট ও বড় মিথ্যা, প্রকৃত মিথ্যা এবং ঠাট্টা করে মিথ্যা বলা হতে বিরত থাক। কেননা, মানুষ যখন ছোট একটি বিষয়ে মিথ্যা বলে, বড় মিথ্যা বলার দুঃসাহস তার সৃষ্টি হয়।'[৮]

ইমাম আসকারী (আ.) বলেছেন : 'যদি সকল শয়তানী কাজ এক ঘরে অবস্থান করে, তবে তার চাবি হলো মিথ্যাবাদিতা।'[৯]

মহানবী (সা.) বলেছেন : 'যখন কোন বান্দা মিথ্যা কথা বলে তখন তার মিথ্যা কথনের দুর্গন্ধের কারণে ফেরেশতা এক মাইল দূরে সরে যায়।'[১০]

ছোট মিথ্যা

আসমা বিনতে ইয়াযীদ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে প্রশ্ন করেন : যদি আমাদের মধ্য হতে কেউ কোন কিছুর প্রতি আগ্রহ বোধ করে (খাওয়ার প্রতি), এবং সে বলে যে, আগ্রহ নেই, তাহলে সেটা কি মিথ্যা হিসাবে পরিগণিত হবে? তিনি বললেন : মিথ্যাকে মিথ্যাই লেখা হবে, এমনকি ছোট মিথ্যাগুলোকে ছোট মিথ্যা হিসাবেই লেখা হবে।'[১১]

সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদীর বৈশিষ্ট্য

মনীষিগণ সত্যবাদীর বৈশিষ্ট্য হিসাবে যে বিষয়গুলো উল্লেখ করেছেন সেগুলো হল সাহসিকতা, স্পষ্টবাদিতা, লোভহীনতা, নিষ্ঠা, গোঁড়ামি না থাকা এবং অতিরিক্ত আবেগ (রাগ এবং অনুরাগ) না থাকা।

এর বিপরীতে একজন মিথ্যাবাদী ভীরু হয়ে থাকে। তার সব কথার মধ্যে অস্পষ্টতা পরিলক্ষিত হয়। সে লোভী হয় এবং তার মধ্যে কপটতা, গোঁড়ামি ও অতিরিক্ত আবেগ দেখা যায়।

আর মিথ্যাবাদিতা ঈমানের সাথে খাপ খায় না। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন : 'মুনাফিকের আলামত তিনটি : যখন সে কথা বলে, মিথ্যা বলে; ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে এবং তার নিকট আমানত রাখা হলে খেয়ানত করে।'[১২]

মিথ্যা বলার কারণ

১. মিথ্যা বলার মূল কারণ হল ঈমানের দুর্বলতা।
২. গোঁড়ামির কারণে মানুষ মিথ্যা কথা বলে।
৩. অতিরিক্ত রাগ ও অনুরাগের বশবর্তী হয়েও মানুষ মিথ্যা কথা বলে।
৪. নিজের প্রতি অন্যদের আকর্ষণ করার জন্য মানুষ মিথ্যা কথা বলে।
৫. কেউ কেউ নিজেকে বড় বলে জাহির করার জন্য মিথ্যা বলে।

মিথ্যার কুফল

১. মিথ্যা বলার ফলে সমাজে কপটতা প্রসার লাভ করে। কারণ, সকল প্রকার কপটতার উৎস হল মিথ্যাবাদিতা।

২. অন্য অনেক বড় গুনাহের উপকরণ হল মিথ্যাবাদিতা। যেমন খেয়ানত, গুজব ছড়ানো, মাপে কম দেয়া, চুক্তি ভঙ্গ করা।

৩. একটি মিথ্যা অনেক মিথ্যার জন্ম দেয়। কারণ, একটি মিথ্যাকে প্রতিষ্ঠা করতে আরও অনেক মিথ্যা কথা বলতে হয়।

৪. যারা মিথ্যা কথা বলে তারা অন্যদেরও একই রকম মিথ্যাবাদী মনে করে। ফলে সমাজে আস্থাহীনতার সৃষ্টি হয়। এমনকি মিথ্যাবাদী নিজের ওপর থেকেও আস্থা হারিয়ে ফেলে।

৫. মিথ্যাবাদী সত্যকে গ্রহণ করার মানসিকতা হারিয়ে ফেলে।

৬. মিথ্যাবাদীর দায়িত্বজ্ঞান লোপ পায়।

৭. মিথ্যাবাদীদের সম্মান না থাকায় সে নির্লজ্জের মতো যে কোন ধরনের কাজে লিপ্ত হয়। এতে সমাজে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়।

৮. মিথ্যাবাদী তার মিথ্যা প্রকাশ হয়ে পড়ার আশংকায় সবসময় মানসিকভাবে অস্বস্তিতে ভোগে।

৯. সর্বোপরি মিথ্যাবাদী আল্লাহ্‌র রহমত ও হেদায়াত থেকে বঞ্চিত। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে :

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ كَـٰذِبٌ كَفَّارٌ ﴿٣﴾

'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মিথ্যাবাদী কাফিরকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।'[১৩]

মিথ্যা থেকে মুক্ত হওয়ার উপায়

১. **উপদেশ ও নসিহত :** যদি মানুষকে উপদেশ প্রদানের মাধ্যমে মিথ্যার পরিণাম সম্পর্কে সচেতন করে তোলা যায় তবে মিথ্যা থেকে মুক্ত থাকা সম্ভব হবে। তাকে এটা বোঝানো দরকার যে, মিথ্যা বলে কেউ কোনদিন মুক্তি পায়নি। একদিন মিথ্যা প্রকাশিত হয়ে পড়ে। আর তখন মানুষ সামাজিকভাবে অপদস্থ হয়। তাকে আরও বোঝানো দরকার যে, মিথ্যার কুফল কেবল মানুষের ইহকালের সাথেই সম্পর্কিত নয়; বরং এর কারণে মানুষ আখেরাতে চূড়ান্ত ক্ষতির সম্মুখীন হবে। অর্থাৎ মিথ্যা পরিত্যাগ না করলে তাকে জাহান্নামে যেতে হবে। পুনঃপুন নসিহত করার মাধ্যমে মানুষ মিথ্যা হতে বাঁচতে পারে।

২. **নিজের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হওয়া :** যদি মানুষ নিজের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হয় তবে সে নিজের মিথ্যা পরিচয় দেওয়া থেকে বিরত থাকবে।

৩. **সত্যকে গ্রহণ করার মানসিকতা তৈরি করা :** জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সত্যকে গ্রহণ করার মানসিকতা তৈরি করার মাধ্যমে মিথ্যা থেকে দূরে থাকা সম্ভব।

৪. **মিথ্যাবাদীদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ :** যদি মিথ্যাবাদীদেরকে বিরত থাকার জন্য নসিহত করা সত্ত্বেও তারা মিথ্যা পরিত্যাগ না করে তবে তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করার মাধ্যমে মিথ্যা থেকে মুক্ত থাকা সম্ভব।

কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে মিথ্যা বলা জায়েয?

ইসলামে একান্ত আবশ্যক ক্ষেত্রে মিথ্যা বলার অনুমতি দেয়া হয়েছে। যেমন জীবন বাঁচানোর জন্য এবং দুই পক্ষের ঝগড়া মেটাতে।

ইমাম জাফর সাদিক (আ.) বলেছেন : 'মিথ্যার নিন্দা করা হয়েছে, কিন্তু দু'টি স্থান ব্যতীত। অত্যাচারীদের অকল্যাণ হতে বাঁচার জন্য এবং মানুষের মাঝে বন্ধুত্ব স্থাপন করার জন্য (কলহ মেটানোর জন্য)।'[১৪]

তাওরীয়া

এমন কথাকে তাওরীয়া বলা হয় যার মধ্যে দু'টি অর্থ থাকে। এর দ্বারা বক্তা একটি ভাবার্থ গ্রহণ করে এবং শ্রোতা অন্যরূপ ভাবার্থ গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে বক্তার উদ্দেশ্য থাকে সে মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকতে চায়, কিন্তু প্রতিপক্ষ এর দ্বারা বিভ্রান্ত হবে। অর্থাৎ সত্য কথা দ্বারাই কাউকে বিভ্রান্ত করা হল তাওরীয়া। একান্ত আবশ্যক ক্ষেত্রে ইসলামে একে জায়েয করা হয়েছে।

উপসংহার

রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট মিথ্যার চেয়ে অধিক ঘৃণিত স্বভাব আর কিছুই ছিল না। কোন ব্যক্তি তাঁর সামনে মিথ্যা কথা বললে সেই বিষয়টি তাঁর স্মরণে থাকত যতক্ষণ না তিনি জানতে পারতেন যে, মিথ্যাবাদী তার মিথ্যা কথন থেকে তওবা করেছে।[১৫]

আর ইমাম আলী (আ.) মিথ্যাবাদীদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে বিরত থাকতে বলেছেন। তিনি বলেন : মিথ্যাবাদীদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন হতে বিরত থাক। কারণ, সে হল লক্ষ্যহীন, সে দূরের জিনিস কাছে দেখাবে এবং কাছের জিনিস দূরে দেখাবে।[১৬]

গীবত

জিহ্বার দ্বারা যে সব কঠিন পাপ কাজ সংঘটিত হয় তার অন্যতম হল গীবত। গীবত করার ফলে মানুষের অন্তর অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায় এবং ধীরে ধীরে তা আল্লাহ্‌র ক্ষমা থেকে মানুষকে বঞ্চিত করার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

গীবত হল কোন ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার দোষ-ত্রুটি নিয়ে আলোচনা করা যা শুনলে সে অসন্তুষ্ট হয়। এ আলোচনা অপরের দৈহিক ত্রুটি, বংশগত ত্রুটি, চারিত্রিক ত্রুটি অথবা কথা, কাজ, পোশাক-পরিচ্ছদের ত্রুটি সম্পর্কিত হলেও তা গীবত বলে পরিগণিত হবে। এমনকি কোন ব্যক্তির গৃহ বা গৃহের আসবাবপত্রের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা হলে তাও গীবত বলে গণ্য হবে।

মহানবী (সা.) একদিন তাঁর সাহাবীদের জিজ্ঞাসা করলেন : 'তোমরা কি জান গীবত কাকে বলে?' সাহাবীরা বললেন : 'আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলই বেশি জানেন।' তিনি বললেন : 'তোমার ভাইয়ের এমন আলোচনা করা যা সে অপছন্দ করে।' সাহাবীরা বললেন : 'যে বিষয়ে আলোচনা করা হয় তা যদি তার মধ্যে থাকে? তিনি বললেন : 'সে বিষয় তার মধ্যে থাকলেই তো গীবত। না থাকলে তা আরও বড় অন্যায়; অর্থাৎ অপবাদ হবে।'[১৭]

গীবত কেবল মৌখিকভাবে সংঘটিত হয় তা নয়; বরং ইশারা-ইঙ্গিত বা অনুকরণের মাধ্যমেও গীবত হতে পারে। হযরত আয়েশা বলেন : 'একবার এক মহিলা আগমন করল। সে যখন চলে গেল, তখন আমি হাতে ইশারা করে প্রকাশ করলাম, সে বেঁটে। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.) বললেন : তুমি তার গীবত করেছ।'[১৮]

পবিত্র কুরআনে গীবত করাকে মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ করার সাথে তুলনা করা হয়েছে :

وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

'এবং তোমাদের কেউ যেন কারও গীবত না করে। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ করা পছন্দ করবে? বস্তুত তোমরা তা অপছন্দ কর।'[১৯]

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন :

إياكُم و الْغيبةَ فَإن الْغيبةَ أشد من الزنا

'তোমরা গীবত থেকে বেঁচে থাক। কেননা, গীবত যিনার চেয়েও কঠিন।'[২০]

এর কারণ হিসাবে বলা হয়েছে, যিনা করে মানুষ তওবা করলে আল্লাহ তা'আলা তওবা কবুল করে নেন, কিন্তু গীবতকারীকে ক্ষমা করা হয় না, যতক্ষণ যার গীবত করা হয় সে ক্ষমা না করে।[২১]

অন্যদিকে গীবতের সামাজিক ক্ষতির দিকটিও ব্যাপক। কারণ, গীবতের মাধ্যমে এক মানুষ অপর মানুষের প্রকাশ্য নিন্দা করে এবং এতে সমাজে ফিতনার সৃষ্টি হয়।

গীবতের কারণ

১. **ক্রোধ :** ক্রোধের বশবর্তী হয়ে কারও গীবত করা হয়।

২. **অন্যদের অনুসরণ :** অপরের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বা অপরের কথার সাথে কথা মিলিয়ে গীবত করা হয়। এক্ষেত্রে মনে করা হয় যে, সামাজিকতার খাতিরে যদি সে অন্য কারও কথায় সায় না দেয় তবে তাকে অসামাজিক বলে চিহ্নিত করা হবে।

৩. **পূর্ব সতর্কতা :** পূর্ব সতর্কতার কারণে গীবত করা হয়। যদি কেউ মনে করে যে তার বিরুদ্ধে কেউ সাক্ষ্য দেবে, তখন সে পূর্ব থেকেই ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে কথা বলতে থাকে যাতে তার কথার গ্রহণযোগ্যতা কমে যায়।

৪. **চিত্তের প্রশান্তি :** নিজের দোষকে হালকা করা বা নিজের পক্ষে সাফাই গাওয়ার জন্যও গীবত করা হয় এভাবে যে, এ কাজটি কেবল আমিই করিনি, আমার সাথে অন্যরাও ছিল।

৫. **গর্ব ও অহংকার :** গর্ব ও অহংকারের কারণে গীবত করা হয়। নিজেকে অন্যের তুলনায় বড় বলে জাহির করার জন্য অন্য ব্যক্তির দোষ বর্ণনা করা হয়।

৬. **হিংসা :** হিংসার কারণেও গীবত করা হয়। যখন এক ব্যক্তির সামনে অপর ব্যক্তির প্রশংসা করা হয় তখন সে ঐ ব্যক্তির প্রতি হিংসার কারণে গীবত করে।

৭. **ক্রীড়া-কৌতুক :** অনেক সময় ক্রীড়া-কৌতুকের বশবর্তী হয়ে গীবত করা হয়। এতে অপরের দোষ বর্ণনা করে নিজে হাসা এবং অপরকে হাসানো লক্ষ্য থাকে।

৮. **সহমর্মিতা প্রকাশ :** কখনও কখনও অন্যের প্রতি সমবেদনা জানাতে গিয়ে গীবত করে। যেমন বলে যে, অমুকের জন্য আমার কষ্ট হয়। কারণ, সে খুবই হতভাগ্য, সে যদি অমুক কাজটি না করত তাহলে সে এতটা দুর্ভাগা হত না।

গীবতের পারলৌকিক পরিণাম

১. একটি হাদীসে বলা হয়েছে : 'যার নিকট কোন মুমিনকে অপদস্থ করা হয় এবং সাহায্য করতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও সে সাহায্য না করে আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন সকলের সামনে তাকে অপদস্থ করবেন।'[২২]

অপর এক হাদীসে বলা হয়েছে : যে ব্যক্তি স্বীয় মুমিন ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার মান-সম্মানের প্রতিরক্ষা করে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তার মান-সম্মান রক্ষা করাকে নিজের ওপর ওয়াজীব মনে করেন।'[২৩]

২. কোন ব্যক্তি যদি অপর কোন ব্যক্তির দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে তবে আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়া ও আখেরাতে তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন।[২৪]

৩. গীবতকারীর সৎ আমলগুলোকে মুছে দেয়া হবে। রাসূল (সা.) বলেছেন : 'কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে আল্লাহ্র সমীপে উপস্থিত করা হবে এবং তার আমলনামা তার হাতে দেয়া হবে। কিন্তু কোন সৎকর্মই তার মধ্যে খুঁজে পাবে

না। তখন সে আল্লাহ্‌কে বলবে : হে আল্লাহ্! এটা আমার আমলনামা নয়। কেননা, আমি এতে আমার কোন ইবাদাত-বন্দেগীই দেখছি না। বলা হবে : তোমার প্রতিপালক না ভুল করেন, আর না ভুলে যান। তোমার কৃতকর্ম অন্যের গীবত করার কারণে বরবাদ হয়ে গেছে। অতঃপর আরেক ব্যক্তিকে আনা হবে এবং তাকেও তার আমলনামা দেয়া হবে। তাতে অনেক ইবাদাতই লিপিবদ্ধ থাকবে। তখন সে বলবে : হে আল্লাহ্! এটা আমার আমল নামা নয়। কেননা, আমি এ ইবাদাতসমূহ আঞ্জাম দেইনি। বলা হবে : অমুক ব্যক্তি তোমার গীবত করেছে তাই আমি তার নেক কর্মসমূহ তোমাকে দান করেছি।'[২৫]

ইমাম জাফর সাদিক (আ.) বলেন :

الْغيبةُ حرام علٰى كُل مسلمٍ و إنها لَتأْكُلُ الْحسنات كما تأْكُلُ النار الْحطَب

প্রত্যেক মুসলমানের ওপর গীবত হারাম। যেভাবে আগুন কাঠকে খেয়ে ফেলে তদ্রূপ গীবত মানুষের নেকীগুলোকে খেয়ে ফেলে।'[২৬]

৪. গীবতকারী কিয়ামতে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে। রাসূল (সা.) বলেছেন : 'মিরাজের রাতে একদল লোককে দেখলাম যে, তারা নখ দিয়ে নিজেদের মুখে আঁচড় কাটছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : হে জিবরীল! এরা কারা? তিনি বললেন : এরা হল মানুষের গীবতকারী ও মানুষের সম্মান বিনষ্টকারী।'[২৭]

গীবত শ্রবণ করা

গীবত শ্রবণ করাও গীবত করার ন্যায় কবীরা গুনাহ। একটি হাদীসে বলা হয়েছে :

الْمستمع أَحد الْمغتابِين

'শ্রোতাও গীবতকারীদের একজন।'[২৮]

হযরত আলী (আ.) বলেন :

السامع الْغيبةَ كالْمغتابِ

'গীবত শ্রবণকারী গীবতকারীর অনুরূপ।'[২৯]

ইমাম জাফর সাদিক (আ.) বলেন : 'গীবত কুফ্‌র স্বরূপ এবং শ্রবণকারী আর তার প্রতি সন্তুষ্টি পোষণকারী হল মুশরিকস্বরূপ।'[৩০]

গীবত থেকে বিরত থাকার সুফল

মহানবী (সা.) বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন সভায় তার ভাইয়ের গীবত শোনে এবং সেটাকে ব্যাহত করে আল্লাহ্‌ তাকে দুনিয়া ও আখেরাতে ১০০০ মন্দ দিককে তার হতে দূর করে দেবেন।'[৩১]

গীবতের কাফ্‌ফারা

গীবতের কাফ্‌ফারা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, যার গীবত করেছ যখনই তার কথা স্মরণ করবে, আল্লাহ্‌র কাছে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে।'[৩২]

গীবত জায়েয হওয়ার ক্ষেত্রসমূহ

যদিও ইসলাম ধর্মে গীবত কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত; কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে গীবত করাটা জায়েয হয়ে যায়। মহানবী (সা.) বলেছেন : 'চার ব্যক্তির নিন্দা করা গীবতের অন্তর্ভুক্ত নয়; যে পাপাচারী নিজের পাপ প্রকাশ করে দেয়। ঐ মিথ্যুক নেতার যাকে অনুগ্রহ করা হলে কৃতজ্ঞ হয় না, আর তার অনিষ্ট করা হলে ক্ষমা করে না। আর যারা ঠাট্টা মশকরা করে মা তুলে গালি দেয়। যারা মুসলিম উম্মাহ হতে বেরিয়ে আমার উম্মতের ত্রুটি বর্ণনা করে এবং তাদের বিরুদ্ধে তলোয়ার হাতে নেয়।'[৩৩]

নিচে গীবত জায়েয হওয়ার ক্ষেত্রগুলো উল্লেখ করা হল :

১. **জুলুমের বিচারপ্রাপ্তি :** জুলুমের বিচার চাওয়ার ক্ষেত্রে গীবত করা জায়েয। যদি কোন অত্যাচারিত ব্যক্তি ন্যায়বিচারের দাবিতে বিচারকের শরণাপন্ন হয় তবে

অত্যাচারীর নাম বর্ণনা করাতে কোন দোষ নেই। সুতরাং অত্যাচারিতদের অত্যাচারীর গীবত করার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে :

۞ لَّا يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوٓءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا

আল্লাহ কোন মন্দ বিষয় প্রকাশ করা পছন্দ করেন না, তবে কারও প্রতি অত্যাচার করা হয়ে থাকলে সে কথা আলাদা, আল্লাহ্ শ্রবণকারী, বিজ্ঞ।[৩৪]

২. **সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ :** মন্দ বিষয় দূর করা অথবা গোনাহগারকে সৎপথে আনার জন্য গীবত করা জায়েয। তবে বিষয়টি যথাযথভাবে হতে হবে।

৩. **পরামর্শের ক্ষেত্রে :** বিবাহের ক্ষেত্রে বা সামাজিক কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের তথ্য জানানোর ক্ষেত্রে কারো দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা জায়েয। এমন পরিস্থিতিতে দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা না হলে তার পরিণাম ভয়াবহ হতে পারে এবং সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে। আর তাই এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত স্বার্থের বিপরীতে সামাজিক স্বার্থকে প্রাধান্য দান করতে হবে।

৪. **শরীয়তের বিধান জানার ক্ষেত্রে :** কোন সমস্যার ক্ষেত্রে শরীয়তের বিধান জানার জন্য যদি কারও কথা উল্লেখ না করলে সঠিক নির্দেশনা জানা না যায় সেক্ষেত্রে গীবত করা জায়েয।

৫. **অনিষ্ট থেকে বাঁচানোর জন্য :** কোন মুসলমানকে অনিষ্ট থেকে বাঁচানোর জন্য গীবত করা জায়েয। উদাহরণস্বরূপ একজন দ্বীনদার ব্যক্তিকে কোন পাপাচারীর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করতে দেখলে সেই পাপাচারী সম্পর্কে তাকে অবহিত করা জরুরি। নইলে দ্বীনদার ব্যক্তিও তার প্রভাবে পাপাচারে লিপ্ত হতে পারে।

৬. **প্রকাশ্য পাপকার্যে লিপ্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে :** যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে পাপকাজ করে এবং তার পাপাচার কারও কাছে গোপন নয় এমন ব্যক্তির গীবত হয় না। যেমন প্রকাশ্য মদপানকারী। মহানবী (সা.) বলেছেন : প্রকাশ্য গুনাহকারীর কোন সম্মান নেই এবং তার গীবত করা জায়েয।'[৩৫]

৭. **মন্দের প্রতিরোধ :** কখনও কখনও সমাজকে নিষ্কলুষ রাখার লক্ষ্যে কারও কারও দোষ-ত্রুটি লোকদেরকে বা অন্ততপক্ষে দায়িত্ববান ব্যক্তিদের অবগত করা জরুরি যাতে তাদের সাহায্য নিয়ে সমাজে অনাচার প্রতিরোধ করা যায় ।

৮. **ধর্মে বিদআত সৃষ্টিকারী :** যারা ধর্মের মধ্যে বিদআত সৃষ্টি করে এবং লোকদের দ্বীন থেকে পথভ্রষ্ট করতে চায় তাদের পরিচয় তুলে ধরা গীবত নয়; বরং এক্ষেত্রে একজন মুসলমানের দায়িত্ব ও কর্তব্য হল তাদের পরিচয় তুলে ধরা ।

৯. **সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে :** সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রেও কারও ত্রুটি বর্ণনা করায় কোন দোষ নেই ।

গীবত থেকে আত্মরক্ষার উপায়

১. **পরিণাম নিয়ে চিন্তা করা :** গীবত থেকে আত্মরক্ষার সবচেয়ে ভাল উপায় হল এর পরিণাম সম্পর্কে চিন্তা করা । মানুষ এটা চিন্তা করবে যে, গীবতের ফলে তার আমলনামা বরবাদ হয়ে যাবে এবং কিয়ামতে তাকে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে । এ চিন্তার মাধ্যমে সে নিজেকে গীবত করা থেকে মুক্ত রাখতে পারবে ।

২. **নিজের দোষ-ত্রুটির দিকে মনোনিবেশ করা :** যখন মানুষ অপরের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করতে যাবে তখনই তাকে এটা মনে করতে হবে যে, সে নিজেও এ দোষ থেকে মুক্ত নয় । তাহলে নিজের মধ্যে যে ত্রুটি রয়েছে সেটার জন্য অন্যকে দোষারোপ করার কোন অধিকারই তার নেই ।

৩. **মানুষের অনুভূতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন :** এ কথা চিন্তা করা যে, যদি অন্য কোন ব্যক্তি তার দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করে তবে তার অনুভূতি কেমন হবে; এ একই অনুভূতি অন্যেরও হবে যখন সে তার দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করবে । এ বিষয়টি তাকে গীবত করা থেকে দূরে থাকতে সাহায্য করবে ।

৪. **গীবত করার কারণ দূর করা :** যে ব্যক্তি গীবত করছে তাকে চিন্তা করে বের করতে হবে যে, সে কোন্ কারণে গীবত করছে । তার মধ্যে যে কারণ সে খুঁজে পাবে সেই কারণ তাকে দূর করতে হবে । যদি ক্রোধের কারণে গীবত করে তবে

তাকে ক্রোধ দমন করতে হবে, যদি হিংসার কারণে গীবত করে তবে হিংসা পরিহার করতে হবে, যদি অন্যের অনুসরণ ও মন রক্ষার জন্য হয় তবে তার চিন্তা করা উচিত, যে বিষয়ে আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হন তাতে যদি মানুষ সন্তুষ্ট হয় তবে এতে কি লাভ? বরং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টিই তার একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত।

অপবাদ আরোপ

অপবাদ আরোপ মানব চরিত্রের অপর বড় স্খলন। কোন ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা হল গীবত, আর যদি কোন ব্যক্তির মধ্যে যে ত্রুটি নেই তা বর্ণনা করা হয় তবে তাকে অপবাদ বলে। এটি গীবতের চেয়েও বড় গুনাহ।[৩৬]

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে :

وَمَن يَكْسِبْ خَطِيٓـَٔةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِۦ بَرِيٓـًٔا فَقَدِ ٱحْتَمَلَ بُهْتَٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿١١٢﴾

'এবং যে কেউ কোন দোষ-ত্রুটি অথবা গুনাহ করে এবং পরে তা অন্য কোন নিরপরাধ ব্যক্তির ওপর চাপিয়ে দেয়, নিঃসন্দেহে সে মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য গুনাহের বোঝা বহন করে।'[৩৭]

অপবাদের প্রকারভেদ

অপবাদ আরোপের তিনটি ভাগ রয়েছে। যথা- মহান আল্লাহ্র প্রতি অপবাদ আরোপ, নবী-রাসূলগণ ও ইমামগণের প্রতি অপবাদ আরোপ ও সাধারণ মানুষের প্রতি অপবাদ আরোপ। এগুলোর মধ্যে মহান আল্লাহ্র প্রতি অপবাদ আরোপ হচ্ছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট অপবাদ। পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে :

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰٓ إِلَى ٱلْإِسْلَٰمِ ۚ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٧﴾

'যে ব্যক্তি ইসলামের দিকে আহূত হয়ে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তার অপেক্ষা অধিক অবিচারক আর কে?'[৩৮]

অপবাদ আরোপের পরিণাম

মহানবী (সা.) বলেন : 'যে ব্যক্তি কোন মুমিনের প্রতি অপবাদ আরোপ করে বা তাকে এমন কোন বিষয়ে অভিযুক্ত করে যে ব্যাপারে সে নির্দোষ তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাকে আগুনের একটি টিলার ওপর দাঁড় করাবেন যতক্ষণ না সে ঐ বিশ্বাসীকে অভিযুক্ত করার ব্যাপারে অনুতাপ করে।'[৩৯]

ইমাম জাফর সাদিক (আ.) বলেন : 'যখন কোন ব্যক্তি তার মুমিন ভাইয়ের প্রতি অপবাদ আরোপ করে তখন তার অন্তর থেকে ঈমান সেভাবেই নষ্ট হয়ে যায় যেভাবে লবণ পানিতে নষ্ট হয়ে যায়।'[৪০]

তাই আমাদের সবার উচিত অন্যের প্রতি অপবাদ আরোপ করা থেকে বিরত থাকা। এমনকি যারা অপবাদ আরোপ করে তাদের সংস্পর্শ থেকেও আমাদের দূরে থাকা উচিত।

চোগলখুরী করা

এক ব্যক্তির কথা অপরের কাছে লাগানোকে চোগলখুরী বলে। এটিও জিহ্বার দ্বারা সংঘটিত অন্যতম বড় গুনাহ। এর মাধ্যমে মানুষ দুই ব্যক্তির সম্পর্কের মধ্যে ফাটল ধরানোর চেষ্টা করে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) একবার সাহাবীদের বললেন : 'আমি কি তোমাদের সর্বাধিক দুষ্ট সম্পর্কে বলব না?' সাহাবীরা আরজ করলেন : 'আপনি বলুন সর্বাধিক দুষ্ট কে।'

তিনি বললেন : 'যে চোগলখুরী করে বন্ধুদের সম্পর্কে ফাটল ধরায় এবং স্বচ্ছ লোকদের দোষ খুঁজে বেড়ায়।'[৪১]

পবিত্র কুরআনে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে :

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۝

'দুর্ভোগ প্রত্যেকের, যে পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে।'[৪২]

এ আয়াতে কোন কোন আলেমের মতে هُمَزَةٍ এর অর্থ যে চোগলখুরী করে।

চোগলখুরীর মাধ্যমে মানুষের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ বৃদ্ধি পায় এবং পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি হয়। তাই আমাদের চোগলখুরী পরিহার করতে হবে এবং একইসাথে চোগলখোরকে পরিহার করাও আমাদের জন্য একান্ত আবশ্যক। কারণ, এমন ব্যক্তি যেভাবে অন্যদের কথা আমাদের কাছে বলে থাকে তেমনি আমাদের কথাও অন্যদের কাছে বলে বেড়ায়।

উপহাস ও বিদ্রূপ করা

মানুষকে উপহাস ও বিদ্রূপ করা খুবই কুৎসিত কাজ এবং বড় গুনাহ। এর মাধ্যমে মুমিন ব্যক্তিকে অসম্মান করা হয়ে থাকে অথচ পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ্ বলছেন :

وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِۦ وَلِلْمُؤْمِنِينَ

'সম্মান কেবল আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও মুমিনদের জন্য।'[৪৩]

আর তাই মুমিনদের প্রতি যে কোন অসম্মানজনক কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। অন্যদিকে পবিত্র কুরআনের আরেকটি আয়াতে বলা হয়েছে :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسۡخَرۡ قَوۡمٞ مِّن قَوۡمٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُونُواْ خَيۡرٗا مِّنۡهُمۡ وَلَا نِسَآءٞ مِّن نِّسَآءٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُنَّ خَيۡرٗا مِّنۡهُنَّۖ وَلَا تَلۡمِزُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَلَا تَنَابَزُواْ بِٱلۡأَلۡقَٰبِۖ بِئۡسَ ٱلِٱسۡمُ ٱلۡفُسُوقُ بَعۡدَ ٱلۡإِيمَٰنِۚ وَمَن لَّمۡ يَتُبۡ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ١١

'হে বিশ্বাসিগণ! কোন ব্যক্তি যেন অপর কোন ব্যক্তিকে উপহাস না করে, হয়তো তারা তাদের অপেক্ষা উত্তম এবং নারীদেরও একদল যেন অন্যদলকে উপহাস না করে, হয়তো তারা তাদের অপেক্ষা উত্তম। তোমরা নিজেদের (মধ্যে একে অপরের) ত্রুটি অন্বেষণ করবে না এবং কাউকে কদর্য নামে সম্বোধন করবে না। কারণ, বিশ্বাস স্থাপনের পর (কাউকে) কদর্য নামে ডাকা গর্হিত কর্ম, যারা এ কর্ম হতে নিবৃত্ত না হয় প্রকৃতপক্ষে তারাই অবিচারক।'[৪৪]

মহানবী (সা.) উপহাসকারীদের সম্পর্কে বলেছেন : 'একজন উপহাসকারীর জন্য বেহেশতের দরজা খুলে দেয়া হবে এবং তাকে বলা হবে : 'এস।' সে তার দুঃখ ও অসহায়ত্ব নিয়ে সামনে অগ্রসর হবে এবং যখন সে ভেতরে প্রবেশ করতে চাইবে তখনই তার সামনে বেহেশতের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে।'[৪৫]

কটু কথা বলা ও অশ্লীলতা

কটুকথা বলার অর্থ হল কাউকে গালি দেয়া বা অপমান করা। এটা নিঃসন্দেহে অন্যায়, কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে এটা যুবকদের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে।

যখন মানুষের ক্ষেত্রে কোন খারাপ কিছু ঘটে অথবা যখন কেউ তাদের অপছন্দনীয় কোন কাজ করে তখন অধিকাংশ মানুষই গালিগালাজ করে। তারা বলে যে, গালি দেয়া তাদের ক্রোধ দমনে সাহায্য করে এবং তাদেরকে আরও খারাপ কোন কিছু করা থেকে বিরত রাখে।

যদিও এটা কিছুটা হলেও সত্য কিন্তু ইসলাম একে প্রত্যাখ্যান করে। কেননা, যে ব্যক্তি তার ক্রোধকে কটু ভাষা প্রয়োগ ছাড়া নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, তার ইচ্ছাশক্তি

খুবই দুর্বল। ইসলামী আচরণের দৃষ্টিকোণ থেকে ঐ ব্যক্তিই মহৎ যে তার ক্রোধকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং ঐ অবস্থায়ও হাসিখুশী থাকে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন :

سباب الْمسلمِ فُسوق و قتالُه كُفْر

'মুসলমানকে গালি দেয়া ফাসেকী এবং তাকে হত্যা করা কুফ্‌রী।'[৪৬]

তাই কাউকে অপমান করার জন্য গালি দেয়া যে কোন অবস্থায়ই অনুচিত। ইসলাম আমাদের কাউকে অসম্মানিত করার শিক্ষা দেয় না। যদি কেউ আমাদের প্রতি অন্যায় করে তাহলে প্রতিবাদ করতে হবে অথবা তাদের বলতে হবে যে, তারা যা বলে তা আমরা পছন্দ করি না।

কিন্তু তাদেরকে অপমান করা হল নিজেকে অতি নিম্ন স্তরে অবনমিত করা এবং ইসলামে এটা গ্রহণযোগ্য নয় যে, কেউ নিজেকে অসম্মানিত করবে।

অন্যকে ঠাট্টা করা বা উত্যক্ত করা থেকে বোঝা যায় যে, সেই ব্যক্তির চরিত্রের একটি অংশ ত্রুটিপূর্ণ। ঠাট্টা করাকে কৌতুক বলে মনে হতে পারে। কিন্তু এটি চিন্তা করা উচিত যে, আমাকে কেউ এভাবে উত্যক্ত করলে আমার অনুভূতি কেমন হবে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন :

إياكُم و الْفحش فَإن اللهَ لَا يحب الْفحش و التفْحيش

'তোমরা অশ্লীলতা থেকে বেঁচে থাক। আল্লাহ্ তা'আলা অশ্লীলতা ও সীমাতিরিক্ত অনর্থক কথা বলা পছন্দ করেন না।'[৪৭]

মহানবী (সা.) বলেন :

إن اللهَ لَيبغض الْفَحش الْبذىءَ

'আল্লাহ্ তা'আলা অশ্লীল ও কটুভাষীকে ঘৃণা করেন।'[৪৮]

মহানবী (সা.) আরও বলেন :

الْحياءُ والْعي شعبتان من الْإيمان و الْبذَاءُ والْبيانُ شعبتان من النفَاقِ

'লজ্জা-সম্ভ্রম ও স্বল্পবাক ঈমানের দু'টি শাখা। অশ্লীলতা ও বাকপটুতা (বাচালতা) নিফাকের (কপটতার) দু'টি শাখা।'[৪৯]

হাস্য-কৌতুক বা মজা করা

ইসলাম ধর্ম কট্টর ও কঠোর ধর্ম নয়। এটি মানুষের নির্মল আনন্দ উপভোগের বিরোধিতা করে না এবং এগুলোকে বৈধ বলেই মনে করে। কিন্তু বল্গাহীন যে কোন কিছু করাকে ইসলাম নিষেধ করেছে।

মানুষ মাঝে মাঝে কৌতুক করে থাকে মজা পাওয়ার জন্য। এটি ইসলামের বৈধ বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। যদি কৌতুকের মধ্যে মিথ্যার সংমিশ্রণ না থাকে, অশ্লীলতা না থাকে ও অন্যকে অপমান করার বিষয় জড়িত না থাকে, তাহলে তা অনিষ্টকর নয়। এমনকি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জীবনীতেও আমরা কদাচিৎ এ বিষয়টি দেখতে পাই। যেমন হযরত আনাস বর্ণনা করেছেন, একবার এক মহিলা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট এসে আরোহণের উপযোগী একটি উটের আবেদন করল। রাসূল (সা.) তাকে বললেন : 'আমি তোমাকে একটি উটের বাচ্চা দেব।' মহিলাটি বলল : 'হে রাসূলাল্লাহ্! উটের বাচ্চা দিয়ে আমি কি করব?' রাসূল জবাব দিলেন, 'বড় উটও তো উটের বাচ্চাই হয়ে থাকে।'[৫০]

তবে যেহেতু কৌতুক বলার ক্ষেত্রে প্রায়শই মিথ্যার আশ্রয় নেয়া হয় এবং অন্যকে অপমান করার বিষয়টি চলে আসে, আর কৌতুককারীরও মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয় তাই ইসলাম বেশি বেশি হাস্য-কৌতুক করাকে পরিহার করতে বলেছে।

ইমাম জাফর সাদিক (আ.) বলেন :

إياكُم و الْمزاح فَإنه يذْهب بِماءِ الْوجه و مهابة الرجالِ

'কৌতুক বলা পরিহার কর। কেননা, তা মানুষের মর্যাদাকে ধ্বংস করে।'[৫১]

তিনি আরও বলেন :

لا تمازح فيتجرؤ عليك

'মানুষ যেন তোমাকে তাচ্ছিল্য করতে না পারে সেজন্য কৌতুক বলা পরিহার কর।'[৫২]

অনেক সময় কৌতুক করার বিষয়টি মানুষ সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে না এবং ভুল বোঝার মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পর্কের অবনতি হয়। এমনকি এর কারণে শত্রুতারও সৃষ্টি হয়।

ইমাম আলী (আ.) বলেছেন :

دع المزاح فإنه لقاح الضغينة

'কৌতুক করা পরিহার কর। যেহেতু এটি শত্রুতা সৃষ্টির অন্যতম কারণ।'[৫৩]

সর্বক্ষণ কৌতুক করা বা হাসি-তামাশা করার ফলে মানুষ তার সত্যিকার পরিচয় ভুলে যায়। ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে সে উদাসীন হয়ে পড়ে এবং তার দায়িত্ব সম্পর্কে অসচেতন হয়ে পড়ে।

মহানবী (সা.) বলেন :

لو تعلمونَ ما أعلم لضحكتم قليلاً و لبكيتم كثيراً

'আমি যা জানি তা যদি তোমরা জানতে তবে খুব কমই হাসতে ও খুব বেশি কাঁদতে।'[৫৪]

হযরত আলী (আ.) বলেন :

من كثُر ضحكُه مات قلبه

'যে ব্যক্তি অতিরিক্ত হাসে তার আত্মা মরে যায়।'[৫৫]

আর এজন্যই অতিরিক্ত হাস্য-কৌতুক থেকে আমাদের বিরত থাকতে হবে।

নিজের গোপনীয়তা রক্ষা করা

নিজের গোপনীয়তা বজায় রাখা ইসলামের নৈতিক গুণাবলীর অন্যতম। ইসলাম একে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। অনেক সময় গোপন কথা জানানোর মাধ্যমে মানুষের মনের দুঃখবোধ লাঘব হয়; কিন্তু এ কাজের জন্য শর্ত হল এমন ব্যক্তির কাছে তা প্রকাশ করতে হবে যে হবে নির্ভরযোগ্য।

আলী (আ.) বলেন :

لَا تؤد عن سرك من لَا أَمانةَ لَه

'অনির্ভরযোগ্য লোকের নিকট তোমার গোপন বিষয় প্রকাশ কর না।'[৫৬]

বিশ্বস্ত ব্যক্তির কাছেও সব গোপন বিষয় প্রকাশ করা উচিত নয়। কারণ, কোন কারণে তা প্রকাশ হয়ে পড়তে পারে। এ প্রসঙ্গে আলী (আ.) বলেন : 'যে তার গোপন বিষয় সংরক্ষণ করে সে অন্যদের ওপর ক্ষমতার অধিকারী। যে কোন গোপন বিষয় যদি দু'জনের বেশি ব্যক্তির মধ্যে ঘটে তবে তা প্রকাশিত হয়ে পড়ে।'[৫৭]

অন্যত্র তিনি বলেন :

سرك أسيرك فَإِنْ أَفْشيته صرت أسيره

'তোমার গোপন বিষয় হল তোমার দাস। যখন তা প্রকাশিত হয়ে পড়ে তখন তুমি তার দাসে পরিণত হবে।'[৫৮]

তিনি আরও বলেন : 'তোমার গোপন বিষয় যখন অপ্রকাশিত থাকে তখন তা তোমাকে সুখে রাখে। যখন তুমি তা প্রকাশ করবে, তা তোমাকে অসুখী ও দুঃখিত করবে।'[৫৯]

অন্যদিকে মানুষ সব সময় একই রকম থাকে না। আজকে যে বন্ধু আগামীকাল সে শত্রুতে পরিণত হতে পারে। তখন সে ঐ গোপন বিষয়কে আমাদের মাথার ওপর মুগুরের মতো ব্যবহার করবে, আর আমাদের আঘাত করবে।

ইমাম সাদিক (আ.) বলেন : 'তুমি তোমার বন্ধুর কাছে ঐ গোপন বিষয় ছাড়া আর কিছু প্রকাশ কর না যেটা তোমার শত্রু শুনলে তুমি কষ্ট পাবে না। হয়তো তোমার বন্ধু কোনদিন তোমার শত্রুতে পরিণত হতে পারে।'[৬০]

শেখ সাদী (র.) বলেছেন : 'তোমার গোপন বিষয়াদি তোমার বন্ধুর কাছে প্রকাশ কর না। তুমি জান না যে, সে তোমার বিরুদ্ধে চলে যাবে কি না। তোমার শত্রুর ওপর কোন আঘাত কর না, সে হয়তো কোনদিন তোমার বন্ধু হতে পারে। যদি তুমি কোন বিষয় গোপন রাখতে চাও তাহলে তা প্রকাশ কর না, এমনকি যদি সে বিশ্বস্তও হয়। তোমার গোপন বিষয় সংরক্ষণের জন্য তোমার নিজের চেয়ে ভাল বন্ধু নেই।'

শেখ সাদী তাঁর একটি কবিতায় বলেন :

'তোমার জন্য নীরব থাকা ভাল এর চেয়ে (যে),
কাউকে বলবে তোমার গোপন বিষয় এবং বলবে তা প্রকাশ না করতে;
হে জ্ঞানী! পানিকে বাধা দাও ঝরনার উৎসমুখে
কারণ, যখন তা উপচিয়ে পড়ে, তখন তুমি পারবে না তা থামাতে
তোমার কোন কিছু বলা উচিত নয় একান্তে
যা বলা যায় না মানুষের সমাবেশে।'

এজন্যই আলী (আ.) বলেছেন :

صدرك أوسع لسِرك

'তোমার গোপন বিষয় সংরক্ষণ করার জন্য তোমার বক্ষই সবচেয়ে প্রশস্ত স্থান।'[৬১]

এ পর্যন্ত আমরা কথা বলা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি। পরবর্তী সংখ্যা থেকে আমরা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ্।

(চলবে)

তথ্যসূত্র

১. মুনতাখাবে মিযানুল হিকমাহ্, হাদীস নং ৩২৫৩
২. আধুনিক প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত সহীহ আল বুখারী, ৫ম খণ্ড, হাদীস নং ৫৬৫৫; ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক প্রকাশিত জামে আত তিরমিযী, ৩য় খণ্ড, হাদীস নং ১৯২১
৩. খিসাল-ই সাদুক, পৃ. ৩২১

৪. সূরা নাহল : ১০৫
৫. তানবীহ আল খাওয়াতীর, পৃ. ৯২
৬. আত তারগীব, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৯৬
৭. কানজুল উম্মাল, ৩য় খণ্ড, হাদীস নং ৮২০৬
৮. বিহারুল আনওয়ার, ৭২তম খণ্ড, পৃ. ২৪৯; মুনতাখাবে মিযানুল হিকমাহ্, পৃ. ২৮৬, হাদীস নং ৫৪৬০
৯. বিহারুল আনওয়ার, ৭২তম খণ্ড, পৃ. ২৬২; মুনতাখাবে মিযানুল হিকমাহ্, হাদীস নং ৫৪৫৬
১০. বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক প্রকাশিত জামে আত তিরমিযী, ৩য় খণ্ড, হাদীস নং ১৯২২
১১. আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯৭; মুনতাখাবে মিযানুল হিকমাহ, পৃ. ৪৮৬, হাদীস নং ৫৪৬২
১২. আধুনিক প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত সহীহ আল বুখারী, ৫ম খণ্ড, হাদীস নং ৫৬৫৫;
১৩. সূরা যুমার : ৩
১৪. বিহারুল আনওয়ার, ৭২তম খণ্ড, পৃ. ২৬৩
১৫. বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক প্রকাশিত জামে আত তিরমিযী, ৩য় খণ্ড, হাদীস নং ১৯২৩
১৬. নাহজুল বালাগাহ্, কালিমাতুল কিসার
১৭. মদীনা পাবলিকেশান্স কর্তৃক প্রকাশিত ইমাম গাযযালী প্রণীত এহইয়াউ উলুমিদ্দীন, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৪৭
১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৮
১৯. সূরা হুজুরাত : ১২
২০. মদীনা পাবলিকেশান্স কর্তৃক প্রকাশিত ইমাম গাযযালী প্রণীত এহইয়াউ উলুমিদ্দীন, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৪৬
২১. আততারগীব ওয়াত তারহীব, ৩য় খণ্ড, হাদীস নং ২৪
২২. মদীনা পাবলিকেশান্স কর্তৃক প্রকাশিত ইমাম গাযযালী প্রণীত এহইয়াউ উলুমিদ্দীন, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৪৮; বিহারুল আনওয়ার, ৭৫তম খণ্ড, অধ্যায় ৬৬, হাদীস নং ১
২৩. মদীনা পাবলিকেশান্স কর্তৃক প্রকাশিত ইমাম গাযযালী প্রণীত এহইয়াউ উলুমিদ্দীন, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৪৯; বিহারুল আনওয়ার, ৭৫তম খণ্ড, অধ্যায় ৬৬, হাদীস নং ১
২৪. বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক প্রকাশিত জামে আত তিরমিযী, ৩য় খণ্ড, হাদীস নং ১৮৮০

২৫. জামেউল আখবার, হাদীস নং ১১৪৪; বিহারুল আনওয়ার ৭৫তম খণ্ড, অধ্যায় ৬৬, হাদীস নং ৩৫
২৬. কাশফুর রিবা, পৃ. ৯
২৭. তানবীহুল খাওয়াতির, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৫; এহইয়াউ উলুমিদ্দীন, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৪৬; বিহারুল আনওয়ার ৭৫তম খণ্ড, অধ্যায় ৬৬, হাদীস নং ১
২৮. মদীনা পাবলিকেশান্স কর্তৃক প্রকাশিত ইমাম গাযযালী প্রণীত এহইয়াউ উলুমিদ্দীন, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৪৮
২৯. গুরারুল হিকাম, হাদীস নং ১১৭১
৩০. মুসতাদরাক, ৯ম খণ্ড, অধ্যায় ১৩৬, হাদীস ১০৪৬২
৩১. আমালীয়ে সাদুক, হাদীস নং ৩৫০
৩২. আল কাফি, ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৪
৩৩. বিহারুল আনওয়ার, ৭৫তম খণ্ড, হাদীস নং ৬৪
৩৪. সূরা নিসা : ১৪৮
৩৫. বিহারুল আনওয়ার, ৭৫তম খণ্ড, হাদীস নং ৩৩
৩৬. বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক প্রকাশিত জামে আত তিরমিযী, ৩য় খণ্ড, হাদীস নং ১৮৮৪
৩৭. সূরা নিসা : ১১২
৩৮. সূরা সাফ্ফ : ৭
৩৯. বিহারুল আনওয়ার, ৭৫ তম খণ্ড, পৃ. ১৯৪
৪০. প্রাগুক্ত, অধ্যায় ৬২, হাদীস নং ১৯
৪১. মদীনা পাবলিকেশান্স কর্তৃক প্রকাশিত ইমাম গাযযালী প্রণীত এহইয়াউ উলুমিদ্দীন, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৫৭
৪২. সূরা হুমাযাহ্ : ১
৪৩. সূরা মুনাফিকুন : ৮
৪৪. সূরা হুজুরাত : ১১
৪৫. কানজুল উম্মাল, হাদীস ৮৩২৮
৪৬. আধুনিক প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত সুনান ইবনে মাজা, ৪র্থ খণ্ড, হাদীস নং ৩৯৩৯
৪৭. মদীনা পাবলিকেশান্স কর্তৃক প্রকাশিত ইমাম গাযযালী প্রণীত এহইয়াউ উলুমিদ্দীন, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৩১
৪৮. বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক প্রকাশিত জামে তিরমিযী, ৩য় খণ্ড, হাদীস নং ১৯৫২
৪৯. প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১৯৭৬

৫০. মদীনা পাবলিকেশান্স কর্তৃক প্রকাশিত ইমাম গাযযালী প্রণীত এহইয়াউ উলুমিদ্দীন, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৩৭
৫১. উসূলে কাফী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৬৫
৫২. প্রাগুক্ত
৫৩. গুরারুল হিকাম
৫৪. আধুনিক প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত সহীহ আল বুখারী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাদীস ৬০৩৫
৫৫. গুরারুল হিকাম
৫৬. প্রাগুক্ত
৫৭. সাফিনাতুল বিহার, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৬৯
৫৮. প্রাগুক্ত
৫৯. সাফিনাতুল বিহার, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৬৯
৬০. প্রাগুক্ত
৬১. বিহারুল আনওয়ার, ৭৫তম খণ্ড, পৃ. ৭১

বিশেষ নিবন্ধ

ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর আবির্ভাব কালে বিশ্বের সার্বিক চিত্র

ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর আবির্ভাব কালের সার্বিক চিত্র

মূল : আল্লামা আলী আল কুরানী

যদিও পবিত্র কুরআন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর চিরন্তন মুজিযা এবং সব যুগে সকল প্রজন্মের জন্য তা নতুন, এতদসত্ত্বেও ইসলাম ধর্মের চির জীবন্ত মুজিযাসমূহের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে মহানবী (সা.) কর্তৃক বর্ণিত ঐ সব হাদীস ও রেওয়ায়াত (বর্ণনা) যা ইসলাম ধর্মের (প্রতিশ্রুত) পুনর্জাগরণ পর্যন্ত মানব জাতির ভবিষ্যৎ জীবন এবং ইসলাম ধর্মের ভবিষ্যৎ গতিধারা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। আর এটি হবে ঐ সময় যখন মহান আল্লাহ্ তাঁর ধর্মকে কাফির ও মুশরিকদের আশা-আকাঙ্ক্ষার বিপরীতে পৃথিবীর সকল ধর্ম ও মতাদর্শের ওপর বিজয়ী করবেন।

ইসলাম ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও বিজয়ের এ যুগই হচ্ছে ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর আবির্ভাবের যুগ যা এ গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়। আর সাহাবী, তাবেয়ী ও সহীহ হাদীস গ্রন্থসমূহের রচয়িতাগণের মাধ্যমে মহানবী (সা.)-এর নিকট হতে বর্ণিত সুসংবাদ প্রদানকারী শত শত রেওয়ায়াতেও এ দুই যুগ ও মহাঘটনা (ইসলামের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও ইমাম মাহ্দীর আবির্ভাব) সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে। আসলে এ দুই মহাঘটনার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই যদিও এ সব রেওয়ায়াতে (বর্ণনার ক্ষেত্রে) পদ্ধতিগত পার্থক্য বিদ্যমান। যদি আহ্লে বাইতের ইমামদের রেওয়ায়াতসমূহ এ সব রেওয়ায়াতের সাথে যোগ করা হয়, তাহলে এতদসংক্রান্ত রেওয়ায়াতসমূহের সংখ্যা ১০০০-এরও অধিক হবে। যদিও ইমামগণ তাঁদের হাদীসগুলো সবসময় মহানবী (সা.)-এর সাথে সম্পর্কিত করেননি, তবে তাঁরা অসংখ্যবার তাগিদ দিয়েছেন যে, তাঁরা যা বর্ণনা করেছেন তা তাঁদের পবিত্র পূর্বপুরুষগণ এবং তাঁদের শ্রদ্ধেয় প্রপিতামহ মহানবী (সা.) থেকেই তাঁরা লাভ করেছেন।

এ সব রেওয়ায়াতে আবির্ভাবের যুগে পৃথিবী, বিশেষ করে যে অঞ্চলে ইমাম মাহ্দী (আ.) আবির্ভূত হবেন সেই অঞ্চল, যেমন ইয়েমেন, হিজায, ইরান, ইরাক, শাম

(সিরিয়া, লেবানন ও জর্দান), ফিলিস্তিন, মিসর ও মাগরিবের (মরক্কো, আলজেরিয়া, তিউনিসিয়া ও লিবিয়া) যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তা ছোট-বড় অনেক ঘটনা এবং বহু ব্যক্তি ও স্থানের নামকে শামিল করে।

আমি অগণিত রেওয়ায়াত ও হাদীসের মধ্য থেকে এ সব রেওয়ায়াত ও হাদীস বাছাই করে যতটা সম্ভব সূক্ষ্ম ও স্পষ্ট করে এবং ধারাবাহিকতা সহকারে সাধারণ মুসলিম পাঠকবর্গের কাছে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি।

এ সব রেওয়ায়াত নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার আগে এ অধ্যায়ে এগুলোর একটি সার সংক্ষেপ উল্লেখ করব যাতে করে ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর আবির্ভাব কালের একটি সাধারণ চিত্র বা ধারণা আমরা পেতে পারি। বেশ কিছু সংখ্যক রেওয়ায়াত ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রস্তুতি সম্পন্ন হওয়ার পরপরই পবিত্র মক্কা নগরী থেকে হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর আবির্ভাবের বিপ্লব ও আন্দোলন শুরু হয়ে যাবে।

এ সব রেওয়ায়াত অনুযায়ী আন্তর্জাতিক পর্যায়ে রোমানদের (পাশ্চাত্য) সাথে তুর্কী এবং তাদের সমর্থকদের (রুশ) বাহ্যত একটি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ সংঘটিত হবে– যা বিশ্বযুদ্ধে রূপান্তরিত হবে।

কিন্তু আঞ্চলিক পর্যায়ে ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর সমর্থক দু'টি সরকার ও প্রশাসন ইরান ও ইয়েমেনে প্রতিষ্ঠিত হবে। মাহ্দী (আ.)-এর ইরানী সঙ্গী-সাথীরা তাঁর আবির্ভাবের বেশ কিছুকাল আগে নিজেদের জন্য একটি সরকার গঠন করে একটি দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে। অবশেষে তারা ঐ যুদ্ধে বিজয়ী হবে।

ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর আবির্ভাবের কিছুকাল আগে ইরানীদের মধ্যে দু'ব্যক্তি (একজন খোরাসানী সাইয়্যেদ যিনি হবেন রাজনৈতিক নেতা এবং অপরজন শুআইব ইবনে সালিহ্ যিনি হবেন সামরিক নেতা) আবির্ভূত হবেন এবং এ দু'ব্যক্তির নেতৃত্বে ইরানী জাতি তাঁর আবির্ভাবের আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

কিন্তু ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর আবির্ভাবের কয়েক মাস আগে তাঁর ইয়েমেনী সঙ্গীদের বিপ্লব বিজয় লাভ করবে এবং তারা বাহ্যত হিজাযে যে রাজনৈতিক শূন্যতার সৃষ্টি হবে তা পূরণ করার জন্য তাঁকে সাহায্য করবে।

হিজাযের এ রাজনৈতিক শূন্যতা সৃষ্টি হওয়ার কারণ হচ্ছে হিজাযের কোন এক বংশের আবদুল্লাহ্ নামের এক নির্বোধ ব্যক্তি সে দেশের সর্বশেষ বাদশাহ্ হিসেবে নিহত হবে

এবং তার স্থলাভিষিক্ত কে হবে– এ বিষয়কে কেন্দ্র করে এমন এক মতবিরোধের সৃষ্টি হবে যা ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর আবির্ভাব পর্যন্ত চলতে থাকবে।

রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে : 'যখন আবদুল্লাহ্র মৃত্যু হবে, তখন জনগণ কোন্ ব্যক্তি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবে– এ ব্যাপারে কোন ঐকমত্যে পৌঁছতে পারবে না। আর এ অবস্থা 'যুগের অধিপতি'র (ইমাম মাহ্দীর) আবির্ভাব পর্যন্ত চলতে থাকবে। বহু বছর রাজত্ব করার দিন শেষ হয়ে কয়েক মাস বা কয়েক দিনের রাজত্ব করার অর্থাৎ ক্ষণস্থায়ী শাসনের পালা চলে আসবে।'

আবু বসীর বলেন : 'আমি জিজ্ঞাসা করলাম : এ অবস্থা কি দীর্ঘকাল স্থায়ী হবে? তিনি বললেন : কখনই না। বাদশাহ্র (আবদুল্লাহ্) হত্যাকাণ্ডের পরে এ দ্বন্দ্ব হিজাযের গোত্রসমূহের মধ্যকার অন্তর্দ্বন্দ্ব ও কলহে পর্যবসিত হবে।'

'(ইমাম মাহ্দীর) আবির্ভাবের নিদর্শনসমূহের অন্যতম হচ্ছে ঐ ঘটনা যা দু'হারামের (মক্কা ও মদীনা) মাঝখানে সংঘটিত হবে। আমি বললাম : কোন্ ঘটনা ঘটবে? তিনি বললেন : দু'হারামের মাঝে গোত্রীয় গোঁড়ামির উদ্ভব হবে এবং অমুকের বংশধরদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বিরোধী গোত্রের পনের জন নেতা ও ব্যক্তিত্বকে অথবা তাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে।'

এ সময়ই ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর আবির্ভাবের নিদর্শনসমূহ স্পষ্ট হয়ে যাবে এবং সম্ভবত এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় নিদর্শন হচ্ছে আসমানী আহ্বান বা ধ্বনি যা তাঁর নামে ২৩ রমযানে শ্রুত হবে।

সাইফ ইবনে উমাইরাহ্ বলেছেন : 'আমি আবু জাফর আল মনসূরের (দ্বিতীয় আব্বাসীয় খলীফা) নিকটে ছিলাম। তিনি কোন ভূমিকা ছাড়াই বললেন : হে সাইফ ইবনে উমাইরাহ্! নিঃসন্দেহে আকাশ থেকে একজন আহ্বানকারী আবু তালিবের বংশধরগণের মধ্য থেকে এক ব্যক্তির নাম ঘোষণা করবে। আমি বললাম : আমি আপনার জন্য উৎসর্গীকৃত, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি কি এ কথা বর্ণনা করেছেন? তিনি বললেন : হ্যাঁ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ, এ কথা আমি আমার নিজ কানে শুনেছি। আমি বললাম : হে আমীরুল মুমিনীন! আমি এখন পর্যন্ত এ ধরনের হাদীস কারও কাছ থেকে শুনিনি। তিনি বললেন : হে সাইফ! এ কথা সত্য। যখন ঐ ঘটনা ঘটবে তখন আমরাই সর্বপ্রথম এ আহ্বানে সাড়া দেব। তবে ঐ ধ্বনি আমাদের একজন পিতৃব্যপুত্রের প্রতি নয় কি? আমি বললাম : সে কি ফাতিমার বংশধর হবে? তিনি বললেন : হ্যাঁ, হে সাইফ! অনন্তর যদি আমি এ

রেওয়ায়াতটি আবু জাফার মুহাম্মাদ ইবনে আলী আল-বাকির থেকে না শুনতাম তাহলে সমগ্র জগৎবাসী আমাকে বললেও আমি তা মেনে নিতাম না। কিন্তু এর বর্ণনাকারী তো ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আলী।'

এ সব রেওয়ায়াত অনুসারে এই আসমানী আহ্বান শোনা যাওয়ার পরই ইমাম মাহ্দী (আ.) গোপনে তাঁর কতিপয় সঙ্গী ও সমর্থকের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করবেন। তখন তাঁর ব্যাপারে সমগ্র পৃথিবীব্যাপী আলোচনা হতে থাকবে এবং তাঁর নাম সবার মুখে মুখে উচ্চারিত হতে থাকবে। তাঁর প্রতি ভালবাসা সবার হৃদয়ে আসন লাভ করবে।

তাঁর শত্রুরা তাঁর আবির্ভাবের ব্যাপারে খুব ভীত হয়ে পড়বে এবং এ কারণে তারা তাঁকে গ্রেফতার করার চেষ্টা করবে। জনগণের মাঝে ছড়িয়ে যাবে যে, তিনি মদীনায় অবস্থান করছেন।

বিদেশী সামরিক বাহিনী অথবা হিজায সরকার সে দেশের অভ্যন্তরীণ অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আনয়ন এবং সরকারের সাথে গোত্রসমূহের দ্বন্দ্ব-সংঘাত নিরসন করার জন্য সিরিয়াস্থ সুফিয়ানী সেনাবাহিনীর সাহায্য চাইবে। এ সেনাবাহিনী মদীনায় প্রবেশ করে হাশেমী বংশীয় যাকে পাবে তাকেই গ্রেফতার করবে। তাদের অনেককে এবং তাদের অনুসারীদেরকে হত্যা করবে এবং অবশিষ্টদেরকে জেলখানায় বন্দি করে রাখবে।

'সুফিয়ানী তার একদল সৈন্যকে মদীনায় প্রেরণ করবে এবং তারা সেখানে এক ব্যক্তিকে হত্যা করবে। মাহ্দী ও মানসূর সেখান থেকে পলায়ন করবে। তারা মহানবীর সকল বংশধরকে গ্রেফতার করবে। আর এর ফলে কোন ব্যক্তিই মুক্ত থাকবে না। সুফিয়ানী বাহিনী ঐ দু'ব্যক্তিকে ধরার জন্য মদীনা নগরীর বাইরে যাবে এবং ইমাম মাহ্দী (ফিরআউনের কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার ব্যাপারে) হযরত মূসা (আ.)-এর মতো ভীত ও চিন্তিত অবস্থায় সেখান থেকে বের হয়ে মক্কাভিমুখে চলে যাবে।'

অতঃপর ইমাম মাহ্দী (আ.) মক্কা নগরীতে তাঁর কতিপয় সঙ্গী-সাথীর সাথে যোগাযোগ করবেন যাতে তিনি পবিত্র হারাম থেকে এশার নামাযের পরে মুহররম মাসের দশম রাতে (আশুরার রাতে) তাঁর আন্দোলনের সূচনা করতে পারেন। তখন তিনি মক্কার জনগণের উদ্দেশে তাঁর প্রথম ভাষণ দান করবেন। এর ফলে তাঁর শত্রুরা তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা করবে। কিন্তু তাঁর সঙ্গী-সাথীরা তাঁকে চারদিক থেকে ঘিরে

ফেলবে এবং শত্রুদেরকে বিতাড়িত করে প্রথমে মসজিদুল হারাম ও তারপর পবিত্র মক্কানগরীর ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করবে।

মুহররম মাসের দশম দিবসের (আশুরার দিবস) প্রভাতে ইমাম মাহ্দী সমগ্র বিশ্ববাসীর উদ্দেশে বিভিন্ন ভাষায় তাঁর বাণী প্রদান করে বিশ্বের জাতিসমূহকে আহ্বান জানাবেন যাতে তারা তাঁকে সাহায্য করে। তিনি ঘোষণা করবেন যে, যে মুজিযার প্রতিশ্রুতি তাঁর শ্রদ্ধেয় প্রপিতামহ হযরত মুহাম্মাদ (সা.) দিয়েছিলেন তা ঘটা পর্যন্ত তিনি পবিত্র মক্কা নগরীতে অবস্থান করবেন। আর উক্ত মুজিযা হবে ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর আন্দোলন দমন করার জন্য পবিত্র মক্কাভিমুখে অগ্রসরমান সুফিয়ানী প্রেরিত বাহিনীর ভূ-গর্ভে প্রোথিত হওয়া।

এ প্রতিশ্রুত মুজিযা বাস্তবায়িত হবে এবং যে সুফিয়ানী বাহিনী পবিত্র মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হয়েছিল তা ধ্বংস হয়ে যাবে।

এ মুজিযার পর ইমাম মাহ্দী (আ.) দশ হাজারেরও অধিক সৈন্য নিয়ে মক্কা থেকে মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হবেন এবং শত্রুবাহিনীর সাথে যুদ্ধের পর সেখানে অবস্থান গ্রহণ এবং মদীনা শত্রুমুক্ত করবেন। এরপর তিনি দুই হারাম (মক্কা ও মদীনা) মুক্ত করার মাধ্যমে হিজায বিজয় এবং সমগ্র অঞ্চলের (আরব উপদ্বীপ) ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করবেন।

কতিপয় রেওয়ায়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম মাহ্দী (আ.) হিজায বিজয়ের পর দক্ষিণ ইরান অভিমুখে রওয়ানা এবং সেখানে খোরাসানী ও শুআইব ইবনে সালিহের নেতৃত্বাধীন ইরানী সেনাবাহিনী ও সেদেশের জনগণের সাথে মিলিত হবেন। তারা তাঁর হাতে বাইআত করবে। তিনি তাদের সহায়তায় বসরায় শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবেন যার ফলে তিনি এক সুস্পষ্ট ও বিরাট বিজয় লাভ করবেন।

এরপর তিনি ইরাকে প্রবেশ করবেন এবং সেখানকার অভ্যন্তরীণ পরিবেশ পরিস্থিতির উন্নতি সাধন করবেন। তিনি সেদেশে সুফিয়ানী বাহিনীর অবশিষ্টাংশ এবং অন্যান্য দলের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে তাদেরকে পরাভূত ও হত্যা করবেন।

এরপর তিনি ইরাককে তাঁর প্রশাসনের কেন্দ্র এবং কুফা নগরীকে রাজধানী হিসাবে মনোনীত করবেন। আর এভাবে ইয়েমেন, হিজায, ইরাক এবং পারস্য উপসাগরীয় দেশসমূহ সর্বতোভাবে তাঁর শাসনাধীনে চলে আসবে।

রেওয়ায়াতসমূহ এ কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যে, ইরাক বিজয়ের পর ইমাম মাহ্দী (আ.) সর্বপ্রথম যে যুদ্ধের উদ্যোগ নেবেন তা হবে তুর্কীদের সাথে তাঁর যুদ্ধ। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

أول لواء يعقده يبعثه إلى الترك فيهزمهم

'প্রথম যে সেনাদল তিনি গঠন করবেন তা তিনি তুর্কীদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করবেন। অতঃপর তা তাদেরকে পরাজিত করবে।'

বাহ্যত তুর্কী বলতে রুশদেরকেও বোঝানো হতে পারে যারা রোমানদের (পাশ্চাত্যের) সাথে যুদ্ধের পর দুর্বল হয়ে পড়বে।

ইমাম মাহ্দী (আ.) সেনাদল গঠন করার পর তাঁর বিশাল সেনাবাহিনীকে কুদ্সে (জেরুজালেম) প্রেরণ করবেন। এ সময় তাঁর সেনাবাহিনী দামেস্কের কাছে 'মার্জ আযরা' এলাকায় আগমন করা পর্যন্ত সুফিয়ানী পশ্চাদপসরণ করতে থাকবে এবং তাঁর ও সুফিয়ানীর মাঝে আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে। তবে ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর প্রতি জনসমর্থন বহুগুণ বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে তাঁর সামনে সুফিয়ানীর অবস্থান এতটা দুর্বল হয়ে পড়বে যে, সুফিয়ানী তাঁর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে চাইবে। কিন্তু এ কাজের জন্য তার ইহুদী-রোমান মিত্র ও পৃষ্ঠপোষক এবং তার সঙ্গী-সাথীরা তাকে তীব্র ভর্ৎসনা করবে।

তারা তাদের সেনাবাহিনী মোতায়েন করার পর ইমাম মাহ্দী (আ.) ও তাঁর সেনাবাহিনীর সাথে এক বিরাট যুদ্ধে লিপ্ত হবে। এ যুদ্ধের উপকূলীয় অক্ষরেখাসমূহ ফিলিস্তিনের আক্কা (عكّا) থেকে তুরস্কের আনতাকিয়াহ্ (انطاكية) পর্যন্ত এবং ভিতরের দিকে তাবারীয়াহ্[১] থেকে দামেস্ক ও কুদ্স পর্যন্ত বিস্তৃত হবে।

এ সময় সুফিয়ানী, ইহুদী এবং রোমান সেনাবাহিনী মহান আল্লাহ্র (ঐশী) ক্রোধে পতিত হবে এবং তারা মুসলমানদের হাতে এমনভাবে নিহত হতে থাকবে যে, তাদের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তি যদি কোন প্রস্তরখণ্ডের পিছনেও লুকায় তখন ঐ প্রস্তরখণ্ড চিৎকার করে বলে উঠবে : 'হে মুসলমান! এখানে একজন ইহুদী লুকিয়ে আছে। তাকে হত্যা করো।'

এ সময় মহান আল্লাহ্র সাহায্য ইমাম মাহ্দী (আ.) ও মুসলমানদের কাছে আসবে এবং তাঁরা বিজয়ী বেশে আল কুদ্সে প্রবেশ করবেন।

---

[১]. এ শহর এবং এ শহরের প্রসিদ্ধ হ্রদটি জবরদখলকৃত ফিলিস্তিনে অবস্থিত।

খ্রিস্টান পাশ্চাত্য আকস্মিকভাবে ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর হাতে ইহুদী ও তাদের পৃষ্ঠপোষক শক্তিসমূহের পরাজয় বরণের কথা জানতে পারবে। তাদের ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হবে এবং তারা ইমাম মাহ্দীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে। কিন্তু আকস্মিকভাবে হযরত ঈসা (আ.) আকাশ থেকে পবিত্র কুদ্সের ওপর অবতরণ করবেন এবং তিনি সমগ্র বিশ্ববাসী, বিশেষ করে খ্রিস্টানদের উদ্দেশে ভাষণ দেবেন।

হযরত ঈসা মসীহ্ (আ.)-এর অবতরণ বিশ্ববাসীর জন্য এমন এক নিদর্শন হবে যা হবে মুসলমান ও খ্রিস্টানদের জন্য আনন্দের কারণ। সম্ভবত হযরত ঈসা (আ.), ইমাম মাহ্দী ও পাশ্চাত্যের মাঝে মধ্যস্থতা করবেন এবং এ কারণে দু'পক্ষের মধ্যে সাত বছর মেয়াদী একটি সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হবে।

কতিপয় রেওয়ায়াত অনুসারে পাশ্চাত্য দু'বছর পরে সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করবে। সম্ভবত এ চুক্তি ভঙ্গ করার কারণ হচ্ছে ঐ ভয়-ভীতি যা ঈসা (আ.) কর্তৃক পাশ্চাত্যের জাতিসমূহের মাঝে গণজাগরণ ও সংহতির জোয়ার সৃষ্টির মাধ্যমে উদ্ভূত হবে। বহু পাশ্চাত্যবাসী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ এবং ইমাম মাহ্দী (আ.)-কে সাহায্য ও সমর্থন দান করবে। এ কারণেই রোমানরা দশ লক্ষ সৈন্যসহকারে সিরিয়া ও ফিলিস্তিনে অকস্মাৎ আক্রমণ চালাবে।

আর মুসলিম বাহিনী তাদের মোকাবিলা করবে এবং হযরত ঈসা (আ.) ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর নীতি অবস্থানের সাথে সামঞ্জস্যশীল করে তাঁর নীতি ঘোষণা করবেন এবং ইমাম মাহ্দীর পেছনে বায়তুল মুকাদ্দাসে নামায আদায় করবেন।

রোমানদের (পাশ্চাত্য) বিরুদ্ধে মহাযুদ্ধ যে সব স্থান বা অক্ষ বরাবর আল কুদ্স মুক্ত করার যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল সে সব স্থানে অর্থাৎ আক্কা থেকে আনতাকিয়া, দামেস্ক থেকে আল কুদ্স (বাইতুল মুকাদ্দাস বা জেরুজালেম) এবং মার্জ দাবিক[২] পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে সংঘটিত হবে। এ মহাযুদ্ধে রোমীয়রা শোচনীয় পরাজয় বরণ করবে এবং (ইমাম মাহ্দীর নেতৃত্বে) মুসলমানগণ স্পষ্ট ও বৃহৎ এক বিজয় লাভ করবে।

এ যুদ্ধের পর ইমাম মাহ্দীর সামনে খ্রিস্টান ইউরোপ ও পাশ্চাত্য বিজয়ের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যাবে। আর দৃশ্যত অনেক জাতি বিপ্লবের মাধ্যমে নিজ নিজ দেশে ইমাম মাহ্দী ও হযরত ঈসা (আ.)-এর বিরোধী সরকারসমূহের পতন ঘটাবে এবং ইমাম মাহ্দীর সমর্থক প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করবে।

---

[২]. জবরদখলকৃত ফিলিস্তিনের একটি এলাকার নাম।

ইমাম মাহ্দী (আ.) কর্তৃক সমগ্র পাশ্চাত্য বিজয় এবং তা তাঁর শাসনাধীনে চলে আসার পর অধিকাংশ পাশ্চাত্যবাসী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে। এ সময় হযরত ঈসা (আ.) ইন্তেকাল করবেন। মাহ্দী (আ.) ও মুসলমানগণ তাঁর জানাযার নামায পড়বেন। হাদীসের বর্ণনা অনুসারে ইমাম মাহ্দী হযরত ঈসা (আ.)-এর জানাযার নামায ও দাফন অনুষ্ঠান প্রকাশ্যে জনতার উপস্থিতিতে সম্পন্ন করবেন যাতে অতীতের মতো তাঁর ব্যাপারে কেউ পুনরায় অগ্রহণীয় উক্তি করতে না পারে। অতঃপর ইমাম মাহ্দী তাঁকে তাঁর মা হযরত মারইয়াম সিদ্দীকা (আ.) নিজ হাতে যে বস্ত্রটি বয়ন করেছিলেন তা কাফন হিসাবে পরিধান করাবেন এবং বাইতুল মুকাদ্দাসে তাঁর মায়ের কবরের পাশে দাফন করবেন।

ইমাম মাহ্দী (আ.) কর্তৃক সমগ্র বিশ্ব বিজয় এবং বিশ্বের সকল দেশ, রাষ্ট্র ও প্রশাসন একটি একক ইসলামী প্রশাসনের আওতায় একীভূত হওয়ার পর তিনি বিশ্বের বিভিন্ন জাতির মাঝে বিভিন্ন পর্যায়ে ঐশী লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। তিনি পার্থিব জীবনের উন্নতি ও বিকাশ এবং মানব জাতির সচ্ছলতা, কল্যাণ ও সুযোগ-সুবিধা বাস্তবায়ন কল্পে বাস্তব উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। তিনি সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার এবং মানব জাতির ধর্মীয় ও পার্থিব জ্ঞানের পর্যায়কে উন্নীত করার চেষ্টা চালাবেন।

কতিপয় হাদীস অনুযায়ী ইমাম মাহ্দী (আ.) মানব জাতির জ্ঞানের সাথে আরও যে জ্ঞান যোগ করবেন তার প্রবৃদ্ধির হার হবে ২৫ : ২ অনুপাতে। অর্থাৎ মানব জাতি এর আগে জ্ঞানের যে দু'ভাগের অধিকারী ছিল তার সাথে আরও ২৫ ভাগ যুক্ত করবেন এবং সার্বিকভাবে মানুষের জ্ঞান তখন ২৭ ভাগ হবে।

সম্ভবত অভিশপ্ত দাজ্জালের অভ্যুত্থান ও ফিতনা ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর যুগে মানব জাতি যে ব্যাপক ও অভূতপূর্ব বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিগত ও বৈষয়িক উন্নতি সাধন করবে তার ফলে ঘটবে অর্থাৎ দাজ্জাল এসবের অপব্যবহারের মাধ্যমে একটি বিচ্যুত ধারা সৃষ্টি করবে। সে মূলত যুবক ও নারীদেরকে ধোঁকা দেয়ার জন্য চোখ ধাঁধানো উন্নত মাধ্যম ও পদ্ধতি ব্যবহার করবে এবং এ শ্রেণীই তার অনুসারী হবে।

দাজ্জাল সমগ্র বিশ্বব্যাপী ফিতনা এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে। তার ধোঁকাবাজি ও প্রতারণার দ্বারা অনেকেই প্রতারিত হবে। অনেকেই তার কথা বিশ্বাস করবে। কিন্তু ইমাম মাহ্দী দাজ্জালের ধোঁকাবাজি প্রকাশ্যে ধরিয়ে দেবেন এবং তাকে ও তার অনুসারীদেরকে হত্যা করবেন।

যা সংক্ষেপে আলোচনা করা হল তা হচ্ছে প্রতিশ্রুত হযরত মাহ্দী (আ.)-এর বিশ্বজনীন আন্দোলন ও বিপ্লবের একটি সার্বিক চিত্র ও পটভূমি। কিন্তু যে যুগে এ সব ঘটনা ঘটবে সে যুগের সবচেয়ে স্পষ্ট নিদর্শন ও ঘটনাবলী রেওয়ায়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে।

প্রথমে যে ফিতনা সমগ্র মুসলিম উম্মাহ্র ওপর আপতিত হবে এবং রেওয়ায়াতসমূহে যা সর্বশেষ ও সবচেয়ে কঠিন ফিতনা বলে অভিহিত হয়েছে তা ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর আবির্ভাবের মাধ্যমে বিদূরিত হয়ে যাবে।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, এ বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগের যাবতীয় সাধারণ ও বিস্তারিত বৈশিষ্ট্য এ শতাব্দীর (বিংশ শতক) শুরুতে পাশ্চাত্য এবং তাদের মিত্র প্রাচ্য দেশসমূহের সৃষ্ট ফিতনার সাথে মিলে যায়। কারণ, এ গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা সকল মুসলিম দেশ ও এ দেশগুলোর সকল পরিবারকে আক্রান্ত করবে। রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে : 'এমন কোন ঘর বিদ্যমান থাকবে না যেখানে এ ফিতনা প্রবেশ করবে না এবং এমন কোন মুসলমান থাকবে না যে এ ফিতনা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না।'

আরেকটি রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে : 'যেভাবে লোভাতুর ক্ষুধার্ত হরেক রকমের সুস্বাদু খাবারের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গোগ্রাসে গিলতে থাকে ঠিক সেভাবে কাফির জাতিসমূহ মুসলিম দেশগুলোর ওপর আক্রমণ চালাবে।'

উল্লেখ্য, আমাদের শত্রুরা তাদের কালো সাম্রাজ্যবাদী কর্তৃত্ব ও আধিপত্যের এ প্রক্রিয়া (ফিতনা) শামদেশ (সিরিয়া ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল) থেকে শুরু করবে এবং সে দেশকে তারা সভ্যতার আলো বিকিরণের উৎস বলে অভিহিত করবে। এর ফলে এমন একটি ফিতনার উদ্ভব হবে যা রেওয়ায়াতসমূহে 'ফিলিস্তিনের ফিতনা' নামে উল্লিখিত হয়েছে। মশকের ভিতরে পানি যেমন আন্দোলিত হয়ে থাকে তেমনি এ ফিতনার কারণে শাম তীব্রভাবে আন্দোলিত হবে এবং লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে।

রেওয়ায়াতসমূহ সে যুগের মুসলমানদের সন্তান ও প্রজন্মসমূহকে এভাবে বর্ণনা করেছে যে, তারা এমনভাবে এ ফিতনা ও বিশৃঙ্খলাময় সংস্কৃতির মধ্যে বেড়ে উঠবে যে, তারা ইসলামী কৃষ্টি ও সংস্কৃতি সম্পর্কে একেবারেই অনবগত থেকে যাবে। সে সব অত্যাচারী শাসনকর্তা অনৈসলামিক বিধি-বিধান এবং প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার ভিত্তিতে মুসলমানদের ওপর শাসন করবে এবং তাদের ওপর সবচেয়ে নিকৃষ্ট পন্থায় নির্যাতন চালাবে।

হাদীসসমূহে উল্লিখিত হয়েছে যে, এ গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলার উদ্গাতা হবে রোমান এবং তুর্কীরা। তুর্কীরা বাহ্যত রুশ জাতি হতে পারে। আর যখন ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর আবির্ভাবের বছরে কতিপয় বড় ঘটনা ঘটবে তখন তারা তাদের সেনাবাহিনীকে ফিলিস্তিনের রামাল্লা, আনতাকিয়া এবং তুরস্ক-সিরীয় উপকূলে এবং সিরিয়া-ইরাক-তুরস্ক সীমান্তে অবস্থিত জাযীরায় (দ্বীপে) মোতায়েন করবে।

বর্ণিত হয়েছে : 'যখন রোমান ও তুর্কীরা (রুশ জাতি) তোমাদের ওপর আক্রমণ চালাবে তখন তারা নিজেরাও পরস্পর দ্বন্দ্ব-সংঘাতে লিপ্ত হবে এবং বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ-বিগ্রহ ও সংঘর্ষ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। তখন তুর্কীদের সমর্থকবৃন্দ জাযীরাহ্ এলাকায় এবং রোমের বিদ্রোহীরা রামাল্লায় অবস্থান গ্রহণের জন্য রওয়ানা হয়ে যাবে।'

রেওয়ায়াতসমূহে আরও বর্ণিত হয়েছে যে, ইরান থেকে ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর আবির্ভাবের সূত্রপাত হবে। তাঁর আবির্ভাব ও প্রকাশের সূত্রপাত প্রাচ্য থেকে হবে এবং যখন ঐ সময় উপস্থিত হবে তখন সুফিয়ানী আবির্ভূত হবে।

অর্থাৎ সালমান ফারসী (রা.)-এর জাতি ও কালো পতাকাবাহীদের হাতে ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর আবির্ভাব ও আত্মপ্রকাশের পটভূমি রচিত এবং কোম নগরী থেকে এক ব্যক্তির হাতে তাদের আন্দোলনের সূত্রপাত হবে।

রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে : 'কোম থেকে এক ব্যক্তি উত্থিত হবে এবং জনগণকে (ইরানী জাতি) সত্যের দিকে আহ্বান করবে। যে দলটি তার চারপাশে জড়ো হবে তাদের হৃদয় ইস্পাত-কঠিন দৃঢ় হবে এবং তারা এতটা অক্লান্ত ও অকুতোভয় হবে যে, যুদ্ধের প্রচণ্ড চাপও তাদের ভীত-সন্ত্রস্ত করবে না এবং তারা যুদ্ধে ক্লান্ত হবে না। তারা সব সময় মহান আল্লাহ্র ওপর নির্ভর করবে। আর শুভ পরিণতি কেবল মুত্তাকী-পরহেজগারদের জন্যই নির্ধারিত।'

তারা (ইরানী জাতি) তাদের অভ্যুত্থান এবং বিপ্লব সফল করার পর তাদের শত্রুদের (পরাশক্তিসমূহের) কাছে অনুরোধ করবে যে, তারা যেন তাদের সার্বিক কর্মকাণ্ডে হস্তক্ষেপ না করে। কিন্তু তারা এ ব্যাপারে জবরদস্তি করবে।

বর্ণিত হয়েছে : 'তারা তাদের অধিকার দাবি করবে কিন্তু তাদেরকে তা দেয়া হবে না। তারা পুনরায় তা চাইবে। আবারও তাদের অধিকার প্রদান করা হবে না। তারা এ অবস্থা দর্শন করতঃ কাঁধে অস্ত্র তুলে নেবে এবং তাদের দাবি বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত তারা তাদের সংগ্রাম অব্যাহত রাখবে। (অবশেষে তাদের অধিকার প্রদান করা হবে) কিন্তু এবার তারা তা গ্রহণ করবে না। অবশেষে তারা রুখে দাঁড়াবে এবং

তোমাদের অধিপতির (অর্থাৎ ইমাম মাহ্দীর) হাতে বিপ্লবের পতাকা অর্পণ করা পর্যন্ত সংগ্রাম অব্যাহত রাখবে। তাদের নিহত ব্যক্তিরা হবে সত্যের পথে শহীদ।'

বিভিন্ন রেওয়ায়াত অনুসারে অবশেষে তারা তাদের দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধে বিজয়ী হবে এবং যে দু'ব্যক্তির প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তারা তাদের মাঝে আবির্ভূত হবেন। এ দু'জনের একজন 'খোরাসানী' যিনি ফকীহ্ ও মারজা অথবা রাজনৈতিক নেতা হিসাবে এবং অপরজন শুআইব ইবনে সালিহ্ যিনি হবেন শ্যামলা বর্ণের চেহারা ও স্বল্প দাঁড়িবিশিষ্ট এবং রাই অঞ্চলের অধিবাসী তিনি প্রধান সেনাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন।

ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর কাছে এ দু'ব্যক্তি ইসলামের পতাকা অর্পণ করে তাঁদের সর্বশক্তি নিয়ে তাঁর আন্দোলনে অংশগ্রহণ করবেন। আর শুআইব ইবনে সালিহ্ ইমামের সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত হবেন। ঠিক একইভাবে বেশ কিছু রেওয়ায়েতে এমন একটি অভ্যুত্থানের কথা বর্ণিত হয়েছে যা সিরিয়ায় উসমান সুফিয়ানীর নেতৃত্বে সংঘটিত হবে। এই উসমান সুফিয়ানী হবে পাশ্চাত্যপন্থী ও ইহুদীদের সমর্থক। সে সিরিয়া ও জর্দানকে একত্রিত করে নিজ শাসনাধীনে নিয়ে আসবে।

এ হচ্ছে এক ধরনের অশুভ ঐক্য যা সুফিয়ানীর মাধ্যমে শামদেশে বাস্তবায়িত হবে। কারণ এর উদ্দেশ্য হবে ইসরাইলের পক্ষে একটি (আরব) প্রতিরক্ষা ব্যূহ এবং ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর হুকুমতের (সরকার ও প্রশাসনের) ক্ষেত্র প্রস্তুতকারী ইরানীদের প্রতিরোধ করার জন্য একটি শক্তিশালী ঘাঁটি ও ফ্রন্ট লাইন গড়ে তোলা। এ কারণেই সুফিয়ানী ইরাক দখল করার পদক্ষেপ নেবে এবং তার সেনাবাহিনী ইরাকে প্রবেশ করবে।

'সে (সুফিয়ানী) এক লক্ষ ত্রিশ হাজার সৈন্য কুফার দিকে প্রেরণ করবে এবং তারা 'রাওহা' ও 'ফারুক' নামক একটি স্থানে অবতরণ করবে। তাদের মধ্য থেকে ষাট হাজার সৈন্যকে কুফার দিকে প্রেরণ করা হবে এবং তারা নুখাইলায় হযরত হূদ (আ.)-এর সমাধিস্থলে অবস্থান গ্রহণ করবে। আর আমি যেন সুফিয়ানীকে (অথবা তার সহযোগী ও সঙ্গীকে) দেখতে পাচ্ছি যে, সে কুফা ও তোমাদের সুবিস্তৃত ও চিরসবুজ জমিগুলোতে অবস্থান নিচ্ছে। তার পক্ষ থেকে একজন আহ্বানকারী উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করতে থাকবে যে, যে ব্যক্তি আলীর অনুসারীদের (কর্তিত) মাথা

আনবে তাকে এক হাজার দিরহাম দেয়া হবে। আর এ সময় প্রতিবেশী প্রতিবেশীর ওপর আক্রমণ চালিয়ে বলবে যে, এ ব্যক্তি তাদের অন্তর্ভুক্ত।'

তখন হিজাযে উদ্ভূত রাজনৈতিক শূন্যতা পূরণ করার জন্য সুফিয়ানীকে উদ্বুদ্ধ করা হবে। ইমাম মাহ্দীর সরকার– যার কথা সবার মুখে মুখে আলোচিত হতে থাকবে এবং মক্কা নগরী থেকে যার শুভ সূচনা হবে তা ধ্বংস করার জন্য সুফিয়ানী সরকারকে শক্তিশালী করা হবে।

এতদুদ্দেশ্যে সুফিয়ানী হিজাযে তার সেনাবাহিনী প্রেরণ করবে। তার সেনাবাহিনী মদীনা নগরীতে প্রবেশ করেই সেখানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে। এরপর তারা পবিত্র মক্কাভিমুখে রওয়ানা হবে। ইমাম মাহ্দী (আ.) মক্কা নগরী থেকেই তাঁর আন্দোলন শুরু করবেন। এরপর পবিত্র মক্কা নগরীতে পৌঁছানোর আগেই সুফিয়ানী বাহিনীকে কেন্দ্র করে যে মহা অলৌকিক ঘটনা (মুজিযা) ঘটার প্রতিশ্রুতি মহানবী (সা.) দিয়েছিলেন তা বাস্তবায়িত হবে অর্থাৎ সুফিয়ানী বাহিনী ভূগর্ভে প্রোথিত হয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

ইরাকে ইরানী ও ইয়েমেনীদের হাতে পরাজয় বরণ এবং ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর হাতে হিজাযে ভূগর্ভে দেবে যাওয়ার মুজিযা সংঘটিত হওয়ার মাধ্যমে সুফিয়ানী বাহিনীর পরাজয় বরণ করার পর সুফিয়ানী পশ্চাদপসরণ করবে। আর ইমাম মাহ্দী সেনাবাহিনী নিয়ে দামেস্ক ও বাইতুল মুকাদ্দাস (আল কুদ্স) অভিমুখে রওয়ানা হবেন। সুফিয়ানী ইমাম মাহ্দী (আ.)-কে মোকাবিলা করার জন্য শামদেশে তার সেনাবাহিনী সংগ্রহ ও পুনর্গঠনে ব্যস্ত থাকবে।

রেওয়ায়াতসমূহে এ যুদ্ধকে 'এক মহা বীরত্বপূর্ণ ঘটনা' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে যা উপকূলীয় এলাকায় আক্কা থেকে সূর (سور) ও আনতাকিয়াহ্ পর্যন্ত এবং শামের অভ্যন্তরে দামেস্ক থেকে তাবারীয়াহ্ ও কুদ্স পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। একইভাবে কতিপয় রেওয়ায়েতে অপর একটি আন্দোলনের কথা উল্লিখিত হয়েছে যা ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর সরকারের ক্ষেত্র প্রস্তুতকারী এবং ইয়েমেনে সংঘটিত হবে। এ আন্দোলন ও বিপ্লবের নেতা ইয়েমেনীকে এ সব রেওয়ায়েতে ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে এবং তাঁকে সাহায্য করা মুসলমানদের ওপর ওয়াজিব বলে গণ্য করা হয়েছে :

'পতাকাসমূহের মধ্যে ইয়েমেনীদের পতাকার চেয়ে হেদায়াতকারী আর কোন পতাকা নেই। ইয়েমেনীর আবির্ভাব ও উত্থানের পর জনগণের কাছে অস্ত্র বিক্রি করা হারাম হয়ে যাবে। আর যখন সে আবির্ভূত হবে এবং আন্দোলন করবে তখন তাকে সাহায্য

করার জন্য দ্রুত ছুটে যাবে। কারণ তার পতাকা হবে হেদায়াতের পতাকা। তার বিরোধিতা করা কোন মুসলমানের জন্য জায়েয হবে না। যদি কোন ব্যক্তি এ কাজ করে তাহলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। কারণ, ইয়েমেনী জনগণকে সত্য ও সৎ পথের দিকে আহ্বান জানাবে।'

অনুরূপভাবে কতিপয় রেওয়ায়াতে ইয়েমেনী ও সুফিয়ানী বাহিনীর আবির্ভাবের আগে একজন মিসরীয় ব্যক্তির আন্দোলনের কথা বর্ণিত হয়েছে। আবার মিসরীয় সেনাপ্রধানের নেতৃত্বে পরিচালিত আরেকটি আন্দোলন এবং মিসরের আশপাশের কিবতীদের পরিচালিত তৎপরতার কথাও ঐ সব রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে। এরপর ঐ সব রেওয়ায়াত মিসরে পাশ্চাত্য অথবা মাগরিবী (মরক্কো, আলজেরিয়া, তিউনিসিয়া ও লিবিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট) সেনাবাহিনীর অনুপ্রবেশ এবং এর পরপরই শামদেশে সুফিয়ানীর আবির্ভাব ও উত্থানের কথা আমাদেরকে অবহিত করে।

তবে অনেক রেওয়ায়াত অনুযায়ী মুসলিম দেশ মাগরিবের (মরক্কো ও পার্শ্ববর্তী দেশসমূহ) সেনাবাহিনী শাম ও মিসরে প্রবেশ করবে। এদের একটি অংশ ইরাকেও প্রবেশ করবে। তাদের ভূমিকা হবে বাধাদানকারী আরব অথবা আন্তর্জাতিক বাহিনীর ভূমিকার ন্যায়। তাই তারা ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণকারী হবে না; বরং এ বাহিনী শামে ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর সরকারের ক্ষেত্র প্রস্তুতকারীদের এবং ইরানী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। এরপর তারা জর্দানের দিকে পশ্চাদপসরণ করবে এবং তাদের অবশিষ্টাংশ সুফিয়ানীর অভ্যুত্থানের পর পশ্চাদপসরণ করবে অথবা তার সাথে যোগ দেবে। অতঃপর তারা মিসরীয়দের আন্দোলন ও গণঅভ্যুত্থানের সম্মুখীন মিসর সরকারের সাহায্যার্থে অথবা শামে সুফিয়ানীর উত্থানের প্রাক্কালে যে পাশ্চাত্য-বাহিনী মিসরে প্রবেশ করবে তাদেরকে সাহায্য করার জন্য মিসরের দিকে দ্রুত অগ্রসর হবে।

ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর আবির্ভাবের যুগের সাথে সংশ্লিষ্ট রেওয়ায়াতটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, শেষ যামানায় ইহুদীরা পৃথিবীর বুকে ফিতনা সৃষ্টি এবং দম্ভ প্রকাশ করবে। তারা নিজেদের সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করবে। মহান আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে তাদের এ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন। তাদের দম্ভ এবং শ্রেষ্ঠত্ব অন্বেষী মনোবৃত্তি ঐ সব পতাকাবাহীর হাতে চূর্ণ হয়ে যাবে যারা খোরাসান (ইরান) থেকে বের হবে।

'ইসলামের ঝাণ্ডাসমূহ আল কুদ্‌সে পত্‌পত্‌ করে ওড়া পর্যন্ত তাদেরকে (খোরাসানীদের) তাদের সিদ্ধান্ত থেকে কোন কিছুই বিরত রাখতে পারবে না।'

কতিপয় রেওয়ায়াত অনুসারে ইমাম মাহ্‌দী (আ.) আনতাকিয়ার একটি গুহা, ফিলিস্তিনের একটি পাহাড় এবং তাবারীয়ার হ্রদ থেকে তাওরাতের আসল কপিগুলো বের করে আনবেন। তিনি তাওরাতের সেই সব কপির ভিত্তিতে ইহুদীদেরকে দোষী সাব্যস্ত করবেন এবং তাদের কাছে নিদর্শন ও মুজিযাসমূহ স্পষ্ট করে প্রকাশ করবেন।

আল কুদ্‌স মুক্ত করার যুদ্ধের পর যে কিছু সংখ্যক ইহুদী বেঁচে যাবে তারা ইমাম মাহ্‌দীর কাছে আত্মসমর্পণ করবে এবং যারা আত্মসমর্পণ করবে না তাদেরকে আরব দেশগুলো থেকে বিতাড়িত করা হবে।

রেওয়ায়াতসমূহ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর আবির্ভাবের কিছু দিন পূর্বে রোমান ও তুর্কীদের মধ্যে অর্থাৎ পাশ্চাত্য ও রাশিয়ার মধ্যে একটি বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হবে যার সূত্রপাত হবে পূর্ব দিক হতে। আরও কিছু সংখ্যক রেওয়ায়াত থেকে এটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, উপরিউক্ত যুদ্ধ আসলে একাধিক আঞ্চলিক যুদ্ধ আকারে সংঘটিত হবে।

ঠিক একইভাবে আরও কিছু সংখ্যক হাদীস থেকে জানা যায় যে, এ যুদ্ধের ফলে সংঘটিত জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াও তার আগে ও পরে সমগ্র বিশ্বব্যাপী যে প্লেগ বা মহামারী দেখা দেবে তাতে বিশ্বের মোট জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ ধ্বংস হবে। তবে পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ব্যতীত মুসলমানগণ সরাসরি এ ক্ষয়ক্ষতির শিকার হবে না।

কিছু কিছু রেওয়ায়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ যুদ্ধ বেশ কয়েকটি ধাপে সংঘটিত হবে। আর ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর আবির্ভাব, তাঁর হিজায মুক্তকরণ এবং ইরাকে তাঁর প্রবেশ করার পরই এ যুদ্ধের সর্বশেষ পর্যায় এসে যাবে।

অনুবাদ : মোহাম্মাদ মুনীর হোসেইন খান

[ড. জহির উদ্দিন মাহমুদ কর্তৃক প্রকাশিত, লেবাননের বিশিষ্ট আলেম আল্লামা আলী আল কুরানী প্রণীত 'আস্‌রে যুহুর' গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ গ্রন্থ 'ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর আত্মপ্রকাশ' থেকে সংকলিত।]

আপনার জিজ্ঞাসা

রাজনীতি কি ধর্ম থেকে পৃথক?

আপনার জিজ্ঞাসা

প্রত্যাশার এবারের প্রশ্নটি পাঠিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র জনাব ইমামুদ্দীন। তাঁর প্রশ্নটি হল : 'আমরা প্রায়ই গণ্যমান্য আলেমবৃন্দের মুখে শুনি এবং তাঁদের লেখায় পড়ে থাকি যে, রাজনীতি ধর্ম থেকে পৃথক নয়। হযরত ইমাম খোমেইনী (র.) বলেছেন : 'খোদার কসম! ইসলামের পুরোটাই হল রাজনীতি।' আর মরহুম আয়াতুল্লাহ শহীদ মোদাররেস বারংবার বলেছেন : 'আমাদের রাজনীতি হল হুবহু ধর্মনীতি এবং আমাদের ধর্মনীতি হল হুবহু রাজনীতি।' এ প্রেক্ষিতে আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই রাজনীতি বলতে কোন্ রাজনীতিকে বোঝানো হয়েছে? কেননা, আজকের দুনিয়ায় রাজনীতি হচ্ছে নানান মিথ্যাচার, ঠগবাজি, প্রতারণা, শয়তানি খেলা এবং বিভ্রান্তকারী চক্রান্তের ছড়াছড়ি। সুতরাং এমতাবস্থায় ধর্ম কীভাবে হুবহু রাজনীতি হতে পারে?

উত্তর : রাজনীতি দু'প্রকার। ইতিবাচক ও নেতিবাচক। সুতরাং রাজনীতির খেলা হল নেতিবাচক ও রূপক রাজনীতির অন্তর্গত। সামগ্রিক বিচারে আসলে এটি রাজনীতিই নয়; বরং এক ধরনের ধোঁকাবাজি ও প্রতারণার নাম, যা মানুষকে বিভ্রান্ত করে ও ধোঁকা দেয় এবং সত্যকে বিকৃত ও উল্টো করে তুলে ধরে; বাতিলকে সৌন্দর্যমণ্ডিত ও আকর্ষণীয় করে তোলে; পানিকে মরীচিকা, আর মরীচিকাকে পানি বলে পরিচয় দেয়।

অন্যকথায়, রাজনীতি শব্দটির আরবি প্রতিশব্দ হল 'সিয়াসাত' (سياست), যা 'সাস' (ساس) ও 'সুস' (سوس) শব্দমূল থেকে নির্গত। এর অর্থ হল রাষ্ট্রপরিচালনা, জনগণের বিষয় সমাধা করা, বিভিন্ন দিক থেকে বুদ্ধিমত্তা, সুপরিকল্পনা ও সঠিক কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে দেশ পরিচালনা, ন্যায় ও ইনসাফের ভিত্তিতে বিচক্ষণতার সাথে উপায় বের করা এবং যে কোন ধরনের দুর্নীতি ও বৈষম্য পরিহার করে চলা। আল্লামা তুরিহী তাঁর 'মাজমাউল বাহরাইন' অভিধানে লিখেছেন :

السياسة القيام على الشيء بما يصلحه

অর্থাৎ 'রাজনীতি হল কোন জিনিসকে যা দ্বারা সমাধান ও সংস্কার করা যায় তা দ্বারা সুরাহা ও সংস্কার করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ।' তিনি আরও লিখেছেন : 'মাসুম ইমামগণের বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় বলা হয়েছে : انتم ساسة العباد অর্থাৎ 'আপনারা হলেন আল্লাহর বান্দাদের রাজনীতিক।' রেওয়ায়াতের মধ্যেও রয়েছে যে, দীন ও মিল্লাতের বিষয়াদি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাঁর নবীর ওপর সোপর্দ করা হয়েছে (ليسوس عباده) যাতে উক্ত নবী আল্লাহর বান্দাদেরকে স্বীয় সিয়াসাত তথা রাজনীতির ভিত্তিতে সংশোধন ও প্রতিপালন করেন।

রেওয়ায়াতে আরও এসেছে যে, বনি ইসরাইলের নবিগণ বনি ইসরাইলকে সিয়াসাত তথা রাজনীতি শিক্ষা দিতেন। অর্থাৎ নেতৃবৃন্দ ও শাসকবর্গের মতোই তাদের নেতৃত্বের দায়িত্বভার ও ব্যাপার পরিচালনার ভার হাতে তুলে নিতেন এবং তাদের জীবনের বিষয়গুলো পরিকল্পনা, সংস্কার ও পরিচালনা করতেন। আর তাদেরকে এর ভিত্তিতেই প্রতিপালন ও গড়ে তুলতেন।[১]

ভাষাতাত্ত্বিকদের বক্তব্য এবং গবেষক ও পণ্ডিতবৃন্দের বিবৃতি আর রেওয়ায়াতের বর্ণনার প্রতি দৃষ্টি রাখলে প্রতিপন্ন হয় যে, 'রাজনীতিক' হল সেই ব্যক্তি যে–

১. ন্যায় ও সত্যের ভিত্তিতে রাষ্ট্র ও জনগণকে পরিচালনা করতে সক্ষম এবং

২. স্বীয় রাজনৈতিক কর্ম-পরিকল্পনায় অতিশয় মেধা, বিচক্ষণতা ও অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ থাকবে। যাতে জেনে-বুঝে দেশের অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রীয় বিভিন্ন সমস্যার সঠিক সমাধান করে উন্নতি ও উৎকর্ষের দিকে পরিচালিত করতে পারে। সে যেন অগ্রগতির নিয়ামকসমূহ সম্পর্কে জ্ঞাত থাকে, প্রতিকূলতাসমূহ সম্পর্কে পরিচিত থাকে। আর উন্নতি ও অগ্রগতির সকল নিয়ামকের যথার্থ প্রয়োগ করে এবং যথাসময়ে প্রতিকূল প্রতিবন্ধকতাগুলো অপসারণ করতে সক্ষম হয়।

এটিই হল সেই সঠিক ও যুক্তিযুক্ত রাজনীতি। যা নবিগণ ও মাসুম ইমামগণের কর্ম ও আদর্শ ছিল। আর এরূপ রাজনীতিই হুবহু ধর্ম বটে এবং এটি ইতিবাচক ও গঠনমূলক রাজনীতি। কখনই প্রকৃত ধর্ম যেমন হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর ইসলাম ধর্ম থেকে এরূপ রাজনীতি পৃথক নয়। এ ধরনের রাজনীতি সম্পর্কেই ইমাম আলী (আ.) বলেছিলেন :

جمال السياسة العدل في الامرة، و العفر مع القدرة

অর্থাৎ 'রাজনীতির সৌন্দর্য হল নেতৃত্বে ন্যায়পরায়ণতা, আর ক্ষমতার সময় ক্ষমা।'[২]

ইমাম হাসান (আ.)-কে জিজ্ঞাসা করা হয় : সিয়াসাত কী? উত্তরে তিনি বলেন :

هي ان تراعي حقوق الله و حقوق الاحياء و حقوق الاموات

'রাজনীতি হল সেটি যে, তুমি আল্লাহর অধিকার এবং জীবিত ও মৃতদের অধিকার পালন করবে।'[৩]

এ প্রকার রাজনীতির বিপরীতে আরেক প্রকার রাজনীতি রয়েছে। যার অর্থ সাম্রাজ্যবাদ, মিথ্যাচার, ধোঁকাবাজি ও প্রতারণা। যা পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলোসহ আরও কতিপয় রাষ্ট্রে সাধারণত পরিদৃষ্ট হয়। এসব রাষ্ট্রের রাজনৈতিক দলগুলোও মূলত এ রূপক ও অন্তঃসারশূন্য রাজনীতির ভিত্তিতেই চলে। আসলে এদেরকে রাজনীতিক বলার চেয়ে রাজনীতিবাজ বলাই শ্রেয়। কারণ, এরা রাজনীতি শব্দটি নিয়ে খেলায় মেতে থাকে। অথচ তাদের নীতি, পন্থা ও কর্ম পরিকল্পনায় সংস্কার ও সংশোধনের জন্য ন্যায়পরায়ণতা ও বিচক্ষণতার কোনই লক্ষণ দেখা যায় না। এভাবেই তারা সংশোধন ও সংস্কারের দাবিদার হয় এবং জনগণকে পরিবর্তনের কথা শুনিয়ে নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করে। কিন্তু তাদের কর্মপন্থাই পরিচয় দেয় যে, তারা দুর্নীতির পেছনেই ছুটছে। সংস্কারের মুখোশের আড়ালে তারা আসলে তাদের অশুভ উদ্দেশ্যকেই চরিতার্থ করতে চায়।

আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.) মু'আবিয়ার রাজনীতিকে এরূপে বিবৃত করেন এবং তার সংস্কারকামিতাকে ঠগবাজি আখ্যা দিয়ে বলেন :

و الله ما معاوية بادهي مني و لكنه يغدر و يفجر و لولا كراهية الغدر لكنت من ادهي الناس

'আল্লাহ্‌র কসম! মু'আবিয়া আমার চেয়ে বেশি রাজনীতিবিদ নয়। তবে সে ঠগবাজি করে ও পাপে লিপ্ত হয়। যদি ঠগবাজি মন্দ বৈশিষ্ট্য না হতো তাহলে আমি মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় রাজনীতিক হতাম।'[৪]

আহলে সুন্নাতের বিখ্যাত পণ্ডিত ইবনে আবিল হাদীদ এ উক্তির ব্যাখ্যায় লিখেছেন : 'যদি রাজনীতির অর্থ হয় জনগণের অন্তরগুলোকে যে কোন ধরনের ধোঁকাবাজি, প্রতারণা, চক্রান্ত, চাটুকারিতা, খোদায়ী সীমারেখা অবজ্ঞা ও অমান্য করা, আর ইসলামী বিধি-বিধানের সীমানা লঙ্ঘন করার কাজে পারস্পরিক বন্ধনে আবদ্ধ করা, তাহলে মু'আবিয়া হযরত আলী (আ.)-এর তুলনায় অধিকতর রাজনীতিবিদ। আর রাজনীতি বলতে যদি এর প্রকৃত অর্থ কাজ-কর্ম ও বিষয়গুলোকে ন্যায়-ইনসাফ ও

ইসলামী নির্দেশাবলীর ভিত্তিতে পরিচালনা করা হয়, যে রাজনীতি প্রত্যেক মুসলমানের অনুসরণ করা উচিত, তাহলে হযরত আলীই অধিকতর রাজনীতিবিদি ।'[৫]

ফলাফল দাঁড়ায় যে, সত্যিকার রাজনীতি ইসলাম থেকে পৃথক নয় । কিন্তু রাজনীতির খেলা কিম্বা প্রতারণা ও অবৈধ পন্থাসমূহের অর্থে যে রাজনীতি, সেটা ইসলাম থেকে আলাদা বটে । ইসলাম কখনও এরূপ রাজনীতির সাথে সম্পর্ক রাখে না । আরও স্পষ্ট করে বলা যায় : রাজনীতি থেকে ইসলামের আলাদা না হওয়ার বিষয়টি চিনতে পারা নির্ভর করে আগে সত্যিকার রাজনীতিকে চেনার ওপর । তদ্রূপ সত্যিকার মুহাম্মাদী (সা.) ইসলামকেও চিনতেও হবে । কিন্তু যদি ইসলাম বিকৃত হয়ে থাকে, তাহলে তা প্রকৃত রাজনীতি থেকে পৃথক । তদ্রূপ নকল রাজনীতিও প্রকৃত ইসলাম থেকে পৃথক । এরই ভিত্তিতে হযরত ইমাম খোমেইনী (র.) জুম'আর নামাযের আহকামের বিষয়ে লিখেছেন :

فمن توهم ان الدين منفك عن السياسة فهو جاهل لم يعرف الاسلام و لا السياسة

'সুতরাং যে ব্যক্তি মনে করবে ধর্ম রাজনীতি থেকে আলাদা, সে এমন একজন জাহেল যে না ইসলামকে চিনেছে, আর না রাজনীতিকে চিনেছে ।'[৬]

আল কুরআনের দৃষ্টিতে সিয়াসাত

পবিত্র কুরআনে কি রাজনীতি সম্পর্কে কোন কথা এসেছে? ধর্ম ও রাজনীতির বন্ধন না কি ধর্ম ও রাজনীতি আলাদা– এ প্রশ্নে কুরআনের মতামত কী?

কুরআনে সিয়াসাত (سياست) কথাটি নেই । কিন্তু সিয়াসাতের আসল তাৎপর্য

কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে এবং বিভিন্ন কাহিনীতে স্পষ্টরূপে ও বিক্ষিপ্তভাবে এবং ব্যাপক পরিসরে উত্থাপিত হয়েছে । উদাহরণস্বরূপ : কুরআনে নবীদের হুকুমত ও বিচার আদালত সম্পর্কে অসংখ্য আয়াত এসেছে । অনুরূপভাবে যুগ যুগান্তরের তাগূতী শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে নবীদের অবিরাম সংগ্রামের কথা, যেমন নমরুদের বিরুদ্ধে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সংগ্রাম, ফিরআউন ও কারূনের বিরুদ্ধে হযরত মূসা (আ.)-এর সংগ্রাম, হযরত মূসা (আ.)-এর হুকুমত গঠন এবং বিভিন্ন ব্যাপারে তাঁর বিচারকার্য পরিচালনা অথবা হযরত সুলায়মান (আ.) ও তাঁর পিতা হযরত দাউদ (আ.)-এর বিশাল হুকুমত, হযরত ঈসা (আ.) ও হযরত ইয়াহিয়া (আ.)-এর স্ব স্ব যুগের কুফ্‌র ও শিরকের প্রতিভূদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম– এ সবই প্রমাণ করে যে, নবীরা রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করতেন এবং আসল অর্থে সিয়াসাত তথা রাজনীতিকে তাঁদের একত্ববাদী দীনি আদর্শের অংশ বলে মনে করতেন । আরও কিছু বিস্তারিত ব্যাখ্যার

জন্য অগণিত আয়াতের মধ্যে থেকে মাত্র কয়েকটি আয়াতের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যে আয়াতগুলো কুরআনের দৃষ্টিতে ধর্ম ও আসল অর্থে রাজনীতির মধ্যকার অবিচ্ছিন্ন বন্ধনকে তুলে ধরে :

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُواْ ٱلطَّغُوتَ

'আমরা প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে একজন রাসূলকে প্রেরণ করেছি এ ভিত্তিতে যে, (জনগণকে বলবে,) এক আল্লাহ্কে উপাসনা কর, আর তাগূতকে পরিহার করে চল।' (সূরা নাহ্ল : ৩৬)

يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓاْ إِلَى ٱلطَّغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوٓاْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِۦ

'পথভ্রষ্ট কাফেররা চায় বিচারের জন্য তাগূত ও মিথ্যা শাসকদের কাছে যাবে? অথচ তাদেরকে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাগূতদের প্রতি কুফ্রী (অস্বীকার) করতে।' (সূরা নিসা : ৬০)

يَـٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلْنَـٰكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ

'হে দাউদ! আমরা তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি নির্ধারিত করেছি। সুতরাং জনগণের মধ্যে সত্য-সঠিক বিচার কর।' (সূরা সাদ : ২৬)

فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُۥدُ جَالُوتَ وَءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكْمَةَ

'বনি ইসরাইল তালুতের নেতৃত্বে জালুতকে (যে ছিল একজন তাগূত) হত্যা করল। আর আল্লাহ রাজত্ব ও প্রজ্ঞা দান করলেন দাউদকে।' (সূরা বাকারা : ২৫১)

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

'কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা বিশ্বাস করবে না যতক্ষণ না তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদ বিচারের ভার তোমার ওপর অর্পণ করে। অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে নেয়।' (সূরা নিসা : ৬৫)

এ আয়াতগুলোসহ কুরআনের আরও অগণিত আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম হুকুমত ও রাজনীতি থেকে আলাদা নয়। আর সমাজের বিধান ব্যবস্থাকে পরিচালনা করার অর্থে যে হুকুমত ও রাজনীতি, তা কুরআনের শিক্ষার পরতে পরতে এমনভাবে প্রবেশ করেছে যে, যদি আমরা চাই এ দু'টির একটিকে অপরটি থেকে পৃথক করতে, তাহলে আসলে যেন আমরা ইসলামকেই ইসলাম থেকে পৃথক এবং কুরআনকেই কুরআন থেকে পৃথক করতে চাইলাম। আর কুরআনবিহীন কুরআন হল স্পষ্ট স্ববিরোধিতা। কিসাস, আমর বিল মারুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার (সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ), গনীমত ও বাইতুল মাল, জিহাদ, প্রতিরক্ষা, খুম্‌স, যাকাত, বিচারাদালত ইত্যাদি যেগুলো কুরআনে সবিস্তারে উত্থাপিত হয়েছে, এর সমস্তই হুকুমাত (শাসনকর্তৃত্ব) ব্যতীত বাস্তবায়নযোগ্য নয়; বরং হুকুমত ও সিয়াসাতের অংশবিশেষ এগুলো দ্বারাই গঠিত হয়। পরিশেষে আমরা এ মর্মে আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.)-এর একটি চমৎকার বক্তব্যের উদ্ধৃতি তুলে ধরতে চাই। তিনি পবিত্র কুরআনের কতিপয় আয়াত, যেমন সূরা আনফালের ২৪ নং আয়াত, সূরা বাকারার ১৭৯ নং আয়াত এবং অনুরূপ কয়েকটি আয়াত তেলাওয়াত করলেন। অতঃপর এরূপ বললেন :

و في هذا اوضح دليل علي انه لابد الامة من امام يقوم بامرهم

আর এর মধ্যেই রয়েছে স্পষ্ট প্রমাণ যে, উম্মতের ইমাম তথা নেতা থাকা চাই যে উম্মতের বিষয়গুলো সুরাহা করবে এবং তাদেরকে আদেশ ও নিষেধ করবে, আল্লাহ্‌র সীমারেখাগুলো তাদের মাঝে প্রতিষ্ঠা করবে, শত্রুর সাথে যুদ্ধ করবে, গনীমতকে ন্যায্যভাবে বণ্টন করবে এবং উত্তরাধিকারের অংশকে উত্তরাধিকারীর হাতে তুলে দেবে এবং সংশোধন ও কল্যাণের দরজাগুলো তাদেরকে দেখিয়ে দেবে। আর যা কিছু তাদের জন্য অনিষ্টকর, তা থেকে তাদেরকে বিরত রাখবে...।'[৭]

তথ্যসূত্র ও টীকা

১. আল্লামা তুরিহী, মাজমাউল বাহরাইন, سوس শব্দমূল, নতুন সংস্করণ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৭৮
২. গুরারুল হিকাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৪
৩. হায়াতুল হাসান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২
৪. নাহজুল বালাগা, খুতবা নং ২০০
৫. ইবনে আবিল হাদীদ, শারহে নাহজুল বালাগা, ১০ম খণ্ড, পৃ. ২১২
৬. ইমাম খোমেইনী, তাহরীরুল ওয়াসিলা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪
৭. তাফসীরে নো'মানী, বিহারুল আনওয়ারের বর্ণনা মোতাবেক, ৯৩তম খণ্ড, পৃ. ৪১

দর্শন ও বিজ্ঞান

প্লেটোনিক ধারণা প্রসঙ্গে

সাদরুল মোতাআল্লেহীন

প্লেটোনিক ধারণা প্রসঙ্গে সাদরুল মোতাআল্লেহীন

যাহ্‌রা মোস্তাফাভী

(পূর্ব প্রকাশের পর)

ইবনে সীনার মতের সমালোচনা

সাদরুল মোতাআল্লেহীন শীরাযী প্লেটোনিক ধারণা সম্বন্ধে ইবনে সীনার ব্যাখ্যার সমালোচনা করেন এবং বলেন যে, তিনি (ইবনে সীনা) যা বলেছেন প্লেটো কখনই এ ধরনের তত্ত্ব প্রদান করেননি। মোল্লা সাদরা বলেন :

'নিঃসন্দেহে প্লেটো– যাঁর ছাত্রদের অন্যতম হচ্ছেন প্রথম 'শিক্ষক'[১] তিনি তাঁর মর্যাদার শ্রেষ্ঠত্বের বদৌলতে এমনই মহান যে, তাঁর প্রতি এ কথা আরোপ করা চলে না যে, তিনি 'আক্‌লভিত্তিক মুক্ততা ও বস্তুগত সত্তাভিত্তিক মুক্ততার মধ্যে পার্থক্য করবেন না।'[২]

সর্বোত্তম ব্যাখ্যা

অবশ্য সাদরুল মোতাআল্লেহীন স্বীকার করেছেন যে, ইবনে সীনার ব্যাখ্যাই হচ্ছে প্লেটোনিক ধারণা সম্বন্ধে সর্বোত্তম ব্যাখ্যা,[৩] তবে প্লেটো যেসব অবস্থানের ওপর ভিত্তি করে তাঁর ধারণাবিষয়ক তত্ত্ব উপস্থাপন করেছেন ইবনে সীনা সেসব অবস্থানের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ভুল করেছেন।

মোল্লা সাদরা বলেন : 'প্লেটোনিক ধারণা সম্বন্ধে *আশ্-শিফা*[৪] গ্রন্থে যে তত্ত্ব উপস্থাপন করা হয়েছে– যাতে বলা হয়েছে যে, প্রাকৃতিক সব কিছুরই 'আক্‌লী জগতে একটি দৃষ্টান্ত রয়েছে যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে তার দৃষ্টান্তসমূহের ন্যায় অভিন্ন ধরনের; এটিই হচ্ছে প্লেটোর জগতের সারকথা। এ ক্ষেত্রে প্লেটো ও সক্রেটিস ভুল করেননি। অতএব, মানুষের মনে যত অবস্তুগত ও বিচারবুদ্ধিগ্রাহ্য জগৎ আছে তার সব কিছুরই যে, 'আক্‌লী জাগতিক অস্তিত্ব আছে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেছেন– এ কথা তাঁর ওপর আরোপ করা ঠিক হবে না। এটি একটি সাধারণ জ্ঞানের কথা যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের সব কিছুরই 'আক্‌লী জাগতিক অস্তিত্ব রয়েছে। কারণ, এতে কোনই সন্দেহ নেই যে, অ্যারিস্টটল ও তাঁর শিক্ষক প্লেটো তাঁদের জ্ঞানগত মর্যাদার দিক থেকে এতই উঁচু যে, তাঁরা দর্শনের প্রাথমিক স্তরের বিষয়ে এ ধরনের ভুল করতে পারেন না।

সোহ্‌রাওয়ার্দীর তত্ত্বের সমালোচনা

সাদরুল মোতাআল্লেহীন শীরাযী বলেন : 'অন্যদিকে শাইখুল ইশরাকের লেখা থেকে এটি সুস্পষ্ট নয় যে, প্রজাতিসমূহের রবের দৃষ্টিতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৃষ্টিসমূহের অভিন্ন সার ও বাস্তবতা বিদ্যমান কি না। শাইখুল ইশরাকের উল্লিখিত প্রমাণসমূহ[৫] থেকে কেবল এতটুকুই বুঝা যেতে পারে যে, যে কোন বস্তুগত অস্তিত্বেরই একটি আদি রূপ আছে যা ঐ সৃষ্টির সাথে সংশ্লিষ্ট এবং তা কেবল ঐ সৃষ্টির দৃষ্টান্তসমূহের পরিকল্পনাকারীই (مدبر) নয়; বরং সেগুলোর অন্যান্য সংঘটনের কারণও বটে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, আদি রূপ ও দৃষ্টান্তের বাস্তবতা অভিন্ন কি না? শাইখুল ইশরাকের উল্লিখিত প্রমাণসমূহে এবং তাঁর রচনাবলিতে এ বিষয়ে কোন আলোচনা করা হয়নি। সুতরাং শাইখুল ইশরাকের রচনাবলীতে সৃষ্টিসমূহের অধিকারী হিসাবে যা ধরা পড়ে তা প্লেটোর রচনাবলিতে উল্লিখিত ঐশী ধারণাসমূহ থেকে স্বতন্ত্র।

দাওয়ানীর মতের সমালোচনা

সাদরুল মোতাআল্লেহীন শীরাযী বলেন : 'মোহাক্কেক দাওয়ানীর মতামত সম্বন্ধে প্রথমেই জানা প্রয়োজন যে, অতীতের যে সব দার্শনিক ঐশী ধারণা নিয়ে আলোচনা

করেছেন তাঁরা নিজেরা একটি 'ধারণায় পরিপূর্ণ বিশ্বে' বিশ্বাস করতেন যা সৃষ্টির পর্যায় বা স্তরগত দিক থেকে 'আক্‌লী জগতের তুলনায় অধস্তন স্তরের ও বস্তুগত জগতের তুলনায় উচ্চতর স্তরের। উক্ত বিশ্বে বিদ্যমান অস্তিত্বসমূহ যদিও বস্তু থেকে স্বতন্ত্র, তবে সেগুলো থেকে পুরোপুরি সম্পর্কহীন নয়। অধিকন্তু সেগুলো হচ্ছে এমন চেতনা যা সংখ্যা ও গুণাবলীর বিচারে বস্তুজাগতিক সৃষ্টির সাথে অভিন্ন।

মানুষের বিস্তারিত ধারণা বা জ্ঞান সম্বন্ধে বলা হয় যে, ধারণাকারী যখন ধারণা পোষণ করে তখন সে 'ধারণার জগতের' সাথে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে যায়, ঠিক যেভাবে 'বিচারবুদ্ধির অধিকারী (عاقل) ও বিচারবুদ্ধির অধীন (معقول)-এর অভিন্নতা' তত্ত্ব অনুযায়ী, বিচারবুদ্ধির অধিকারী সর্বজনীনতা ও 'আক্‌লসমূহের জগতের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং ধারণাসমূহের জগৎ হচ্ছে বস্তুগত জগতের অনুরূপ একটি জগৎ এবং সে জগতের সত্তাসমূহের এ বস্তুজগতের সত্তাসমূহের ন্যায় অভিন্ন গুণাবলী রয়েছে। এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, বস্তুজগতে যেখানে বস্তুগত অস্তিত্বসমূহ রয়েছে সেখানে ধারণার জগতের অস্তিত্বসমূহ বস্তু থেকে মুক্ত, কিন্তু তার ঘটনাবলী থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। এ বর্ণনা থেকে এটি সুস্পষ্ট যে, প্লেটো এবং তাঁর শিক্ষকগণ ও তাঁর শিষ্যগণ মনে করতেন যে, ঐশী ধারণাসমূহ 'আক্‌লসমূহের জগতের অস্তিত্ব, ধারণাসমূহের জগতের অস্তিত্ব নয়।

মীর দামাদের মতের সমালোচনা

সাদরুল মোতাআল্লেহীন শীরাযী তাঁর শিক্ষক মীর মোহাম্মাদ বাকের দামাদের এতদসংক্রান্ত মতের সমালোচনায় বলেন : 'তিনি (মীর দামাদ) যা বলেছেন তা মেনে নিলে ধরে নিতে হয় যে, বস্তুজগতে যতগুলো ব্যক্তি ও সত্তা রয়েছে ঠিক সমসংখ্যক প্লেটোনিক 'আক্‌লী ধারণা থাকতে হবে। কারণ, প্রতিটি বস্তুগত অস্তিত্বের স্থায়ী চিত্র কেবল সেটির জন্যই সুনির্দিষ্ট এবং তা অন্য বস্তুগত অস্তিত্বের স্থায়ী চিত্র থেকে পৃথকীকরণযোগ্য। অথচ প্লেটোর অভিমত অনুযায়ী বস্তুজগতের প্রতিটি প্রজাতির জন্য কেবল একটি 'আক্‌লী ধারণা রয়েছে। বস্তুজগতের প্রতিটি দৃষ্টান্ত ও সত্তার জন্য একেকটি স্বতন্ত্র 'আক্‌লী ধারণা নেই।

মোল্লা সাদরার ব্যাখ্যা

সাদরুল মোতাআল্লেহীন শীরাযী ঐশী প্লেটোনিক ধারণাসমূহ সম্বন্ধে শীর্ষস্থানীয় ইসলামী দার্শনিকগণের মতামতের যে সমালোচনা করেছেন তা উল্লেখের পর এবার আমরা এ সব 'আক্‌লী অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁর মত নিয়ে আলোচনা করব।

এ ব্যাপারে মোল্লা সাদরা যে তত্ত্ব উপস্থাপন করেছেন তাতে নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয় শামিল রয়েছে :

ক. প্রজাতিসমূহ ও ধারণাসমূহের স্বরূপের অভিন্নতা

সাদরুল মোতাআল্লেহীন বলেন যে, প্লেটোনিক ধারণাসমূহ, প্রজাতিসমূহ ও বস্তুগত অস্তিত্বসমূহ অভিন্ন স্বরূপের অধিকারী এবং তাদের অস্তিত্বের ধরন পরস্পর থেকে স্বতন্ত্র; একটি বস্তুগত ও অপরটি 'আক্‌লী। কিন্তু তাদের সার ও স্বরূপ অভিন্ন। অর্থাৎ বস্তুগত সত্তাসমূহের যে কোন প্রজাতির বস্তুজগতে বস্তুগত দৃষ্টান্তসমূহ রয়েছে এবং ধারণার জগতে এর একটি আদর্শ ('আক্‌লী) দৃষ্টান্ত রয়েছে। এ বিষয়টি (point) হচ্ছে এ ব্যাপারে তাঁর (প্লেটোর) ধারণা ও শাইখুল ইশরাকের ধারণার মধ্যকার পার্থক্যের প্রধান স্তম্ভ। কারণ, শাইখুল ইশরাক খোলাখুলিভাবে বস্তুগত প্রজাতিসমূহের স্বরূপ ও সেসবের প্লেটোনিক ধারণার অভিন্নতাকে গ্রহণ করেননি।

সাদরুল মোতাআল্লেহীন বলেন : 'বস্তুজগতে বস্তুগত সত্তাসমূহের আকৃতি 'আক্‌লী জগতি স্থিত সত্তাসমূহের– যা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক সৃষ্ট– অনুরূপ। কারণ, প্রতিটি সত্তার স্বরূপ হচ্ছে তার আকৃতি বা রূপ। অতএব, এ দুই সত্তার স্বরূপ অভিন্ন।'[৬]

খ. ধারণাসমূহের 'আক্‌লী অস্তিত্ব

সাদরুল মোতাআল্লেহীন মোহাক্কেক দাওয়ানীর মতের সমালোচনা করতে গিয়ে যেমন বলেছেন, ঐশী প্লেটোনিক ধারণা হচ্ছে 'আক্‌লী অস্তিত্ব, তা ধারণাসমূহের জগতের অস্তিত্ব নয়। এ কারণেই তিনি অনেক সময় এগুলোকে 'আক্‌লী ধারণা বা অবস্তুগত ধারণা বলে উল্লেখ করেছেন।

কুরআন মজীদের আয়াত : 'এমন কোন বস্তু নেই যার 'ভাণ্ডারসমূহ' আমার কাছে নেই।'[৭]-এ উল্লিখিত 'বস্তুসমূহের ভাণ্ডার' সম্পর্কে সাদরুল মোতাআল্লেহীন বলেন :

'এ ভাণ্ডারসমূহ হচ্ছে প্রাকৃতিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রজাতিসমূহের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার সামনে সমুপস্থিত অবস্তুগত আকৃতি ও 'আক্‌লী ধারণাসমূহ। প্লেটোর মতে, সমস্ত প্রাকৃতিক প্রজাতির জন্যই এগুলোর বস্তুগত অস্তিত্ব ব্যতীত স্বতন্ত্র রূপ আছে।'[৮]

প্রাকৃতিক রূপ সম্বন্ধে তিনি বলেন : 'প্রাকৃতিক রূপসমূহকে বাস্তবে একটি আক্‌লী রূপে (বস্তু থেকে পৃথক করে) অনুধাবন করা যায়। আর প্লেটো ও তাঁর অনুসারিগণ ঐশী অবস্তুগত ধারণাসমূহ সম্বন্ধে এ মতই পোষণ করতেন।'[৯]

প্রাকৃতিক রূপসমূহকে বাস্তবে 'আক্‌লী অস্তিত্ব হিসাবে এবং পদার্থ থেকে ও তার বস্তুগত রূপ পরিগ্রহ হতে আলাদা হিসেবে অনুভব করা যেতে পারে। প্লেটো ও তাঁর ছাত্রগণ ঐশী অবস্তুগত ধারণাসমূহ সম্বন্ধে এ ধরনের মতই পোষণ করতেন।

গ. প্রজাতিসমূহ ও ধারণাসমূহের মধ্যে সম্পর্ক

ধারণাসমূহ ও বস্তুগত প্রজাতিসমূহের মধ্যকার সম্পর্ক সম্বন্ধে সাদরুল মোতাআল্লেহীন শীরাযীর রচনাবলীতে বিভিন্ন ও বিচিত্র ধরনের সূত্রের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। একদিকে তিনি ধারণাসমূহকে বস্তুগত অস্তিত্বসমূহের জন্য অস্তিত্বলাভের ও টিকে থাকার কারণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন, অন্যদিকে তিনি বলেন যে, এতদভয়ের মিল হচ্ছে ছায়া ও মূল বস্তুর মধ্যকার সম্পর্কের ন্যায়। তেমনি, তিনি ধারণাসমূহকে বস্তুগত অস্তিত্বসমূহের অন্তস্তলের অংশ বলেও উল্লেখ করেছেন।

এখানে আমরা এ প্রসঙ্গে সাদরুল মোতাআল্লেহীনের কতগুলো উক্তি উল্লেখ করব এবং এ থেকে একটি সমন্বিত উপসংহারে উপনীত হবার পন্থাও পাওয়া যাবে। তিনি মনে করেন যে, কারণ ও ফলাফলের মধ্যকার সম্পর্ক বাস্তব রূপায়নের (تشأن) পর্যায় থেকে শুরু হয় এবং তিনি মনে করেন যে, ফল হচ্ছে কারণেরই রূপসমূহের (شُئُون) অন্যতম। এ প্রসঙ্গেও তিনি বাস্তব রূপায়নের বিভিন্ন পর্যায়ের ভিত্তিতে প্লেটোনিক ধারণাসমূহকে বস্তুগত অস্তিত্বসমূহের জন্য কারণ, অন্তস্তল ও ছায়াধারী হিসাবে গণ্য করেন। তিনি বলেন : 'দেহধারী প্রতিটি প্রজাতিরই সৃষ্টিজগতে একটি

পূর্ণাঙ্গ রূপ আছে যা সংশ্লিষ্ট প্রজাতির দৃষ্টান্তসমূহের উৎস। আর একই সাথে বিষয়টি এমন যে, দৃষ্টান্তসমূহ এর ফলরূপ শাখা হিসাবে উদ্গত হয়।'[১০]

তিনি আরও বলেন যে, প্লেটোনিক ধারণাসমূহ হচ্ছে বস্তুগত প্রজাতিসমূহের সাথে সম্পর্কিত 'আক্‌লী বিষয়বস্তু ও আধ্যাত্মিক ধারণা এবং এগুলো আল্লাহ্ তা'আলার সন্নিধানে অবস্থান করছে। বস্তুগত প্রজাতিসমূহের তুলনায় এ 'আক্‌লী উপাদানসমূহ অভ্যন্তরীণ রহস্যাবলীর সংগঠক, বস্তুগত জীবনের রক্ষক, সৃষ্টির মাধ্যম, টিকে থাকার নিশ্চয়তা প্রদানকারী ও দৃষ্টান্তসমূহের পুনরাবৃত্তিকারী।[১১] এগুলো হচ্ছে এমন রূপ যা প্রাকৃতিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপসমূহের অন্তস্তল।'[১২]

তিনি বলেন : 'ধারণাসমূহ হচ্ছে বিদ্যমান সত্য– বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপসমূহের সাথে যার সম্পর্ক হচ্ছে ছায়ার সাথে ছায়ার উৎসের ও ধারণার সাথে ধারণার উৎসের সম্পর্কের অনুরূপ। আর সেগুলো (ধারণাসমূহ) হচ্ছে এই বিদ্যমান ও নবায়নরত ছায়াসমূহের উৎস। কারণ, এক হিসাবে সেগুলো হচ্ছে কর্তা ও রূপ, কারণ, উপরিউক্ত মূলনীতি অনুযায়ী প্রকৃতপক্ষে সেগুলো হচ্ছে 'আক্বল্-এরই বাস্তব রূপ এবং সেগুলো সম্ভাবনাবিহীন নয়।'[১৩] কারণ, সম্ভাবনাময় 'আক্বলী অস্তিত্বসমূহ ও বস্তুগত অস্তিত্বসমূহ সম্ভাবনার অধিকারী এবং ধারণাসমূহ হচ্ছে মূল বিষয়বস্তু ও বস্তুগত অস্তিত্বসমূহের রূপ। সুতরাং এতদুভয়ের সম্পর্ক হচ্ছে ছায়ার উৎস ও ছায়ার মধ্যকার সম্পর্কের অনুরূপ।

ঘ. ধারণা ও অপরিহার্য সত্তা[১৪]র মধ্যকার সম্পর্ক

আমরা এখানে যে আলোচনা করছি তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে এ উপ-শিরোনামের অংশটি। কারণ, সাদরুল মোতাআল্লেহীনের রচনাবলীতে ধারণাসমূহ ও স্থির সৃষ্টিসমূহের (اعيان ثابته) মধ্যকার সম্পর্কের কথা যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে তা থেকে আমরা খুব সহজেই ধারণা সম্পর্কিত তত্ত্ব ও স্থির সৃষ্টিসমূহের মধ্যকার মিল লক্ষ্য করতে পারি।[১৫]

তেমনি সাদরুল মোতাআল্লেহীন ধারণাসমূহ ও পরম ও নিরঙ্কুশ ক্ষমতাবান অপরিহার্য সত্তার মধ্যকার সম্পর্ক নির্দেশ করার জন্য সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিভাষা ব্যবহার করেছেন।

তিনি এ ক্ষেত্রে যে সব পরিভাষা ব্যবহার করেছেন তার মধ্যে মৌলিক পরিভাষা হচ্ছে 'উদ্ভাবন' যার মানে প্লেটোনিক ধারণাসমূহ হচ্ছে সর্বশক্তিমানের উদ্ভাবন।

তাঁর রচনাবলীতে আমরা আরও কতগুলো ধারণা লক্ষ্য করি; এর মধ্য থেকে কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হবে।

একটি ব্যাখ্যা

এ অলোচনার পূর্ববর্তী অংশে মোল্লা সাদরার যে ভিন্নমতের উল্লেখ করা হয়েছে তার সাথে এখানে আমরা নিম্নোক্ত বিষয়টি উল্লেখ করা বিশেষভাবে প্রয়োজন বলে মনে করি। তা হচ্ছে, এ মনীষীর লেখায় 'কারণ ও ফলাফল' বিধির সম্পর্কের বিষয়টি বিভিন্ন আঙ্গিকে ও বিভিন্ন শিরোনামে আলোচনা করা হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে স্টোয়িক দার্শনিকদের মতামতের অনুসরণে তিনি কারণ ও ফলাফলকে দু'টি স্বতন্ত্র অস্তিত্বরূপে উল্লেখ করেছেন– যার একটি স্বীয় অস্তিত্বের জন্য অপরটির ওপর নির্ভরশীল। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি এতদুভয়ের মধ্যকার সম্পর্ককে অধিকতর গভীর ও অধিকতর সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যাখ্যা করেছেন। অবশেষে তিনি এ ব্যাপারে ইসলামী 'ইরফানের দৃষ্টিকোণে উপনীত হন এবং তদনুযায়ী 'কারণ ও ফলাফল' বিধি এবং আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর সৃষ্টিনিচয়ের মধ্যকার সম্পর্কের ওপর আলোকপাত করেন। এভাবে তিনি ইসলামী দার্শনিকদের দ্বারা সূচিত 'অপরিহার্য সত্তা ও তিনি ছাড়া আর সব কিছুর সাথে তাঁর সম্পর্ক' সংক্রান্ত আলোচনায় উপসংহার প্রদান করেন।[১৬]

আল্লাহ্ তা'আলার সন্নিধানে সমুপস্থিত মুক্ত ঐশী রূপসমূহ তাদের নিজেদের সার সম্পর্কে সচেতন নয়, আর একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত আর কেউই তাদের অস্তিত্ব অনুভব করে না। প্লেটো ও স্টোয়িক দার্শনিকগণের মতে, এর কারণ হল, তারা তাদের নিরঙ্কুশ আনুগত্যজনিত কারণে আল্লাহ্ তা'আলাতে বিলুপ্ত এবং যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা চিরস্থায়ী সেহেতু এ কারণেই তারা স্থায়িত্ব লাভ করেছে বা টিকে আছে। আর আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্বের সত্যতার কারণেই তারা অস্তিত্বমান থাকে।[১৭]

তিনি আরও বলেন : 'আল্লাহ্ তা'আলার সত্তার জ্যোতি, সমুদ্ভাসিতা নূর ও ক্রিয়াশীলতা আছে, আর কী ভাবেই বা তা না থেকে পারে? কারণ, গোটা অস্তিত্বলোকই তো তাঁর নূরের দ্বারা এবং তাঁর বহিঃপ্রকাশের দ্বারা সমুদ্ভাসিত। প্লেটো ও তাঁর অনুসারিগণ এ সব জ্যোতি ও নূরকে 'সমুদ্ভাসিত ধারণাসমূহ' ও 'ঐশী রূপসমূহ' বলে অভিহিত করেছেন।'[১৮]

বস্তুত প্লেটোনিক রূপসমূহ হচ্ছে ঐশী জ্ঞান ও মহান রবের জ্ঞানের ভাণ্ডার। আর যেহেতু সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলী হচ্ছে সকল কিছুর সার (جوهر)-এর অভিন্ন রূপ, সেহেতু সাদরুল মোতাআল্লেহীন বলেন : 'ঐ সব 'আক্‌লী রূপ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলী ও ঐশী জ্ঞান ('ইল্‌মে ইলাহী) যা তাঁর মহান সত্তার অনুগত, অন্যদিকে মহান আল্লাহ্‌র মহত্ত্ব ও পরম প্রতাপ তাঁর নিজের সত্তার কারণেই, এসব 'আক্‌লী রূপের কারণে নয়। প্রকৃতপক্ষে এ 'আক্‌লী রূপগুলো হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলী। অবশ্য এর মানে এ নয় যে, চিরন্তনত্ব-পূর্ব কোন বহুত্ব থাকতে হবে। তেমনি এ কারণে এক, একক ও অবিভাজ্য খোদায়ী সত্তার পূর্ণতার প্রয়োজন হওয়ারও কোন কারণ নেই। কারণ, এই 'আক্বলী রূপসমূহ মহান আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সত্তা। আর তাদের সত্যতা ও অস্তিত্ব খোদায়ী সত্যতা ও অস্তিত্ব থেকে স্বতন্ত্র কিছুও নয়।'[১৯]

সাদরুল মোতাআল্লেহীন তাঁর *মাফাতীহুল্ গায়ব্* গ্রন্থে[২০] একই ধারণা তুলে ধরেছেন। তেমনি তিনি অন্যত্রও বলেছেন : 'অবস্তুগত রূপসমূহ মোটেই এ বিশ্বের অংশ নয়, তেমনি তা 'আল্লাহ্ ছাড়া অন্য সব কিছুর' অংশও নয়। প্রকৃতপক্ষে সেগুলো হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞান ও পরিপূর্ণ কালাম যা এখনও সমাপ্ত হয়নি এবং তা বিলুপ্ত হয়েও যাবে না। যেমন, মহান আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন : 'তোমাদের কাছে যা কিছু আছে তা নিঃশেষ হয়ে যাবে, আর যা কিছু আল্লাহ্‌র কাছে আছে তা টিকে থাকবে।'[২১] তেমনি আল্লাহ্ তা'আলা আরও এরশাদ করেছেন : '(হে রাসূল!) বলুন, আমার রবের কালেমাহ্ সমূহের জন্য (তা লেখার জন্য) যদি সমুদ্রের পানি কালিতে পরিণত হত তাহলে আমার রবের কালেমাহ্‌সমূহ শেষ হবার আগেই সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যেত, এমনকি এর সাহায্যার্থে যদি আমরা অনুরূপ (আরও সমুদ্র) নিয়ে আসতাম।'[২২/২৩]

মোল্লা সাদরার মতের সংক্ষিপ্তসার

ওপরের আলোচনা থেকে আমরা এ উপসংহারে উপনীত হতে পারি যে, সাদরুল মোতাআল্লেহীনের মতে, প্লেটোনিক অবস্তুগত রূপসমূহ হচ্ছে ঐশী জ্ঞান এবং তা হচ্ছে চিরন্তন-পূর্ব হতে চিরন্তন পর্যন্ত জ্ঞান। বস্তুগত জগতের সকল কিছুরই সার আছে যা সেই বস্তুগত রূপসমূহের অনুরূপ। অধিকন্তু আমাদের এ জগতের সব কিছুই সেই অবস্তুগত রূপসমূহের ছায়ামাত্র। আর তার ধরন এমন যে, তাঁরা উক্ত অবস্তুগত রূপসমূহকে 'ধারণা' বলে অভিহিত করেছেন।

অতএব, প্লেটোনিক ধারণাসমূহ হচ্ছে 'আক্‌লী অস্তিত্ব এবং আল্লাহ্ তা'আলার এক ধরনের জ্ঞান– আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত। সেগুলো সারসত্তার মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে আছে এবং তার সারের স্থায়িত্বের ওপর নির্ভরশীল। অধিকন্তু তা 'আল্লাহ্ ছাড়া অন্য সব কিছু'র অংশ নয়। এ সমুদ্ভাসিত ধারণাসমূহ সত্য এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্তাসমূহের উৎস, তেমনি এগুলোর রয়েছে সেগুলোর (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্তাসমূহের) অনুরূপ সার। তেমনি এগুলো ইন্দ্রিয়জ অনুভূতিসমূহের কারণ ও সংগঠকও বটে।

দ্বিতীয় আলোচনা : মোল্লা সাদরার প্রমাণ ও ধারণাসমূহ

প্রথম প্রমাণ

সাদরুল মোতাআল্লেহীন শীরাযী তাঁর প্রথম প্রমাণে 'উন্নততর সম্ভাবনা'র দার্শনিক মূলনীতির আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। তাঁর আগে শাইখুল ইশরাক সোহরাওয়ার্দী অবস্তুগত ধারণাসমুহ প্রমাণের লক্ষ্যে এ মূলনীতির আশ্রয় গ্রহণ করেন। মোল্লা সাদরা শাইখুল ইশরাকের মতামত ব্যাখ্যা করার পর তাতে কিছু সমস্যা (ত্রুটি) নির্দেশ করেন। তিনি দেখিয়ে দেন যে, সোহরাওয়ার্দী তাঁর দর্শনে উক্ত মূলনীতির জন্য যে ভাষা ব্যবহার করেছেন তাতে স্ববিরোধিতা রয়েছে।[২৪]

এখানে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই তা হচ্ছে 'উন্নততর সম্ভাবনা'র দার্শনিক মূলনীতি প্রয়োগের পন্থা সম্বন্ধে মোল্লা সাদরার অভিমত। এ প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, মোল্লা সাদরা 'আক্‌লী সত্তাসমূহের জগতের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য এ মূলনীতি ব্যবহার করেছেন।[২৫] এছাড়া তিনি অবস্তুগত ধারণা

সংক্রান্ত প্রশ্নসমূহের জবাব দানের জন্যও এ মূলনীতি ব্যবহার করেছেন। তিনি সোহরাওয়ার্দীর মতামতের সমালোচনা করতে গিয়ে এক জায়গায় বলেছেন যে, শাইখুল ইশরাক উপরিউক্ত মূলনীতির আশ্রয় নিয়ে সাধারণভাবে 'আকলের জগতের অস্তিত্ব ছাড়া আর কিছু প্রমাণ করতে পারেননি। একই সাথে তিনি তাঁর 'প্রজাতিসমূহের অধিকারিগণ' প্রমাণ সংক্রান্ত অভিসন্দর্ভে সোহ্‌রাওয়ার্দীর মতামতকে 'সর্বাধিক সম্ভাবনাময় দিক' হিসাবে অভিহিত করেন।[২৬] সুতরাং এ মূলনীতি ব্যবহার করতে গিয়ে তিনি যে ভাষা ব্যবহার করেছেন তা আরও বেশি মনোযোগের দাবিদার।[২৭]

সাদরুল মোতাআল্লেহীন শীরাযীর মতে, 'উন্নততর সম্ভাবনা'র দার্শনিক মূলনীতি হচ্ছে এমন একটি মূলনীতি প্রথমত যা প্রতিটি প্রজাতির 'আক্‌লী রূপের অস্তিত্ব প্রমাণ করে এবং যে কোন দেহধারী প্রজাতির জন্য 'আক্‌লী মূলনীতিসমূহের ও বস্তুগত প্রজাতিসমূহের ওপর 'আক্‌লী সত্তাসমূহের তৎপরতার প্রমাণ হিসাবে তা খুব কমই কাজে লাগে। এর মানে হচ্ছে, প্রতিটি বস্তুগত প্রজাতির জন্য একটি 'আক্‌লী দৃষ্টান্ত ও অবস্তুগত রূপ রয়েছে।

এ ধরনের 'আক্‌লী রূপসমূহের অস্তিত্বের প্রমাণ হচ্ছে এই যে, সকল বস্তুগত প্রজাতির জন্যই মনের ভিতরে একটি সার রয়েছে এবং এই মানসিক সার একটি সম্ভব সত্তা। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, বাস্তবে এ ধরনের সারের অনুভূতি এমনভাবে সম্ভব যে, মানসিক সারের মতই স্বীয় দৃষ্টান্তসমূহের সাথে এ সারের অনুরূপ সম্পর্ক রয়েছে এবং তা বস্তু ও তার 'পরবর্তী আনুষঙ্গিকতাসমূহ' থেকে স্বতন্ত্র। এ ধরনের সত্তা যদি বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করে তাহলে অবশ্যই তা বস্তুজাগতিক সত্তাসমূহের ও মনের ভিতরে নিহিত ও মননির্ভর এ ধরনের সারবিশিষ্ট 'আক্বলী সত্তার তুলনায় উন্নততর হবে। অতএব, এটি অবশ্যই উন্নততর এবং একে পূর্ব-অস্তিত্বসম্পন্ন হতে হবে। কারণ, একে স্বতঃ-অস্তিত্বশীল পদ্ধতিতে পাওয়া যায়।

এখন আমাদের দেখতে হবে যে, বস্তুগত সারের পক্ষে কি অবস্তুগত অস্তিত্বের অধিকারী হওয়া সম্ভব? এ ধরনের বস্তুগত সারের অস্তিত্বলাভের পথে কি কোন বাধা আছে?

এ প্রশ্নের জবাবে মোল্লা সাদরা বলেন, বস্তুগত সারসমূহের জন্য অবস্তুগত অস্তিত্বের অধিকারী হওয়া সম্ভব। কারণ, সার স্বয়ং একটি সম্ভব অস্তিত্ব এবং এ সত্তার

অস্তিত্বলাভের পথে (তাত্ত্বিকভাবে) কোন বাধা নেই, যদি না তা কতক বাধার মুখোমুখি হয় যা এখানে কয়েকটি আপত্তি আকারে উল্লেখ করে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে :

১. কোন বস্তুগত সারের জন্য বিচারবুদ্ধিভিত্তিকতা (عقليت) সম্ভব নয় ।

জবাব : মনে এ ধরনের সারের জন্যও 'আক্‌লী (বিচারবুদ্ধিগত – عقلي) অস্তিত্ব পাওয়া যেতে পারে এবং আপনি নিশ্চিত হতে পারছেন যে, মনে সারের 'আক্বলী অস্তিত্ব রয়েছে । অতএব, বস্তুগত সারের জন্য 'আক্‌লী অস্তিত্ব প্রমাণিত ।

২. 'আক্বলী সত্তাকে অবশ্যই স্বতঃ-অস্তিত্বশীল[২৮] হতে হবে, অথচ বস্তুগত দৃষ্টান্তসমূহ পদার্থের ওপর নির্ভরশীল এবং একটি সারের জন্য তার সত্তায় এ ধরনের দ্বিবিভাজন সম্ভব নয় ।

জবাব : অস্তিত্বে এটি সম্ভব যে, এর কোন প্রজাতির দৃষ্টান্তসমূহ বিভিন্ন হবে; কতগুলো বস্তুতে প্রকাশিত হবে, অথচ একই সময় কতগুলো বস্তুতে প্রকাশিত হবে না । এছাড়া সত্তাসমূহের শক্তি ও দুর্বলতা সারের দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের মধ্যে পার্থক্যের সৃষ্টি করে না ।

৩. 'আক্‌লী সত্তা অযৌগিক, কিন্তু বস্তুগত সত্তাসমূহ যৌগিক ।

জবাব : প্রাকৃতিক বা বস্তুগত জগতে যত রকমের যৌগিক সত্তা রয়েছে তার সাধারণ অবস্থা ও স্বরূপ হচ্ছে তার রূপ বা গঠনে । কারণ, প্রতিটি সত্তারই বাস্তব রূপায়ন ঘটে তার রূপ বা গঠনের মাধ্যমে । তার বহুত্ব থাকে তার শক্তিতে । উদাহরণস্বরূপ, একজন প্রাকৃতিক বা বস্তুজাগতিক মানুষ হচ্ছে একটি একক সত্তা যা তার গঠনের একত্বকে নির্দেশ করে, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমূহকে নয় । সুতরাং যৌগিক বস্তুগত সত্তা ও অযৌগিক 'আক্‌লী সত্তা উভয়েরই একটি অভিন্ন সত্যতা রয়েছে । দৈহিক বা ভৌতিক সত্তাসমূহের যৌগিকতার কারণে 'আক্‌লী সত্তাসমূহ যৌগিক সত্তায় পরিণত হয়ে যায় না ।

দ্বিতীয় প্রমাণ

সাদরুল মোতাআল্লেহীন তাঁর এ প্রমাণে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্তাসমূহের বৈশিষ্ট্যাবলির সাহায্য নিয়েছেন । তাঁর প্রমাণটি নিম্নরূপ :

আমরা যদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্তাসমূহের– যার প্রতিটিরই বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে– স্বরূপ ও সার নিয়ে পর্যালোচনা করি তাহলে আমরা দেখতে পাই যে, স্বরূপ ও সার-এর মূলনীতিতে কোনরূপ আকস্মিক ঘটনার বা সংযোজনের অনিশ্চিত সম্ভাবনা নেই। উদাহরণস্বরূপ, পর্বতের স্বরূপের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট আকার-আয়তনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, বা সেটাকে কোন একটি সুনির্দিষ্ট স্থানে বা বিশেষ পরিস্থিতিতে সংঘটিত হতে হবে, অন্যথায় পর্বতের জন্য একটির বেশি দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে না। কিন্তু কার্যত আমরা বিভিন্ন ঘটনা ও বিভিন্ন সংযোজনের মাধ্যমে পর্বতের অনেক দৃষ্টান্ত দেখতে পাই।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্তাসমূহের এসব ঘটনা ও বৈশিষ্ট্য ইন্দ্রিয়ের কাছে বস্তুটির একটি পরোক্ষ বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে। কোন সত্তার জন্য যদি এ ধরনের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ঘটনার কোন একটি অনিশ্চিত সম্ভাবনা না থাকে তখন তা হবে বিচারবুদ্ধি দ্বারা বোধগম্য বিষয় এবং তা হবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের বহির্ভূত বিষয়। যেহেতু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্তাসমূহের সার ও স্বরূপে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ঘটনাবলির অনিশ্চিত সম্ভাবনা নিহিত নেই সেহেতু এসবের ইন্দ্রিয়লব্ধ অনুভূতিসমূহ বিচারবুদ্ধি দ্বারা বোধগম্য। যেহেতু যে কোন জিনিসের সত্যতা হচ্ছে তাতে কোন ধরনের সংযোজন ও পরিবর্তনের পূর্ববর্তী, সেহেতু যে কোন সারের 'আক্‌লী সত্তা একই সারের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্তার অগ্রবর্তী।

অবশ্য সাদরুল মোতাআল্লেহীন 'আক্‌লী সত্তাসমূহ ও 'আক্‌লসমূহের জগতের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য এ প্রমাণটি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু যেহেতু এ প্রমাণের বক্তব্যে অবস্তুগত রূপসমূহের ও প্লেটোনিক ধারণাসমূহের প্রমাণও নিহিত রয়েছে, সেহেতু এখানে আলোচ্য বিষয়ের জন্য তার সাহায্য নেয়া হল।[২৯]

তৃতীয় প্রমাণ

মোল্লা সাদরা এ প্রমাণটিকে প্রাচ্য আধ্যাত্ম দর্শন বা প্রাচ্য 'ইরফান হিসেবে অভিহিত করেছেন এবং তিনি রূপ বা কাঠামো প্রমাণের জন্য অন্যান্য প্রমাণ উপস্থাপনের সময় এটি উপস্থাপন করেননি।[৩০] তিনি বলেন : 'আপনি যদি আরও অনুসন্ধান করতে চান তাহলে আপনাকে এ বস্তুগত প্রজাতিসমূহের অবস্তুগত রূপসমূহ প্রমাণের জন্য প্রাচ্য আধ্যাত্ম দর্শনের পক্ষ থেকে উপস্থাপিত প্রমাণ শুনতে (ও গ্রহণ করে নিতে) হবে। আর তাহলে (এর মানে হবে এই যে,) আপনি আমাদের প্রাচ্য জ্ঞানসমূহ থেকে

অনুধাবন করেছেন যে, সকল প্রাকৃতিক রূপেরই সত্যতা তাদের সন্নিকটবর্তী জাতিগত বৈশিষ্ট্যে নিহিত রয়েছে।'[৩১]

এ উদ্ধৃতির শুরুর দিক থেকেই যা বোঝা যায় তা হচ্ছে, তাঁর বক্তব্যের এ অংশটি অবস্তুগত রূপসমূহের একটি প্রমাণ। অন্যদিকে এ আলোচনার ধারাবাহিকতায় তিনি প্রজাতিসমূহের প্রভুর অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য তিনটি প্রমাণ উল্লেখ করেছেন যা থেকে বোঝা যায় যে, তাঁর রচনাবলীতে এ দিকটি স্রেফ প্লেটোনিক ধারণাসমূহের ব্যাখ্যামাত্র এবং তাকে একটি বিধিবদ্ধ প্রমাণরূপে উপস্থাপন করা চলে না, অন্যদিকে তিনি পরে যে তিনটি প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন তা গ্রহণযোগ্য প্রমাণ-উপস্থাপন। তবে প্রজাতিসমূহের প্রভুর অস্তিত্ব প্রমাণের জন্যও স্বতন্ত্র প্রমাণ হিসেবে এ বক্তব্যগুলোও বিবেচনা করা ও ব্যাখ্যা করা চলে।

প্রমাণটি নিম্নরূপ :

যে কোন প্রাকৃতিক সত্তার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে, যদিও তার বিভিন্ন প্রাজাতিগোষ্ঠী ও জাতিগত পৃথকীকরণ বৈশিষ্ট্য[৩২] থাকতে পারে এবং তা বিভিন্ন পরস্পর সন্নিকটবর্তী প্রাজাতিগোষ্ঠীসমূহের সমন্বয়ে গঠিত হতে পারে এবং তার অব্যবহিত জাতিগত পৃথকীকরণ বৈশিষ্ট্যও থাকতে পারে। সন্নিকটবর্তী প্রজাতিগোষ্ঠীতে থাকবে বর্গ (genera) ও জাতিগত পৃথকীকরণের অন্য বৈশিষ্ট্য, যতক্ষণ না তা তার প্রজাতিগোষ্ঠীতে ও দূরতম জাতিগত পৃথকীকরণের বিশেষ বৈশিষ্ট্যে উপনীত হয়। সে যা-ই হোক, উক্ত সত্তাটির পুরো স্বরূপ হচ্ছে তার জাতিগত পৃথকীকরণ বৈশিষ্ট্য; জাতিগত পৃথকীকরণের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য ও বর্গ অব্যবহিত জাতিগত পৃথকীকরণ বৈশিষ্ট্যের জন্য পথ করে দেয় মাত্র। এর মানে হচ্ছে, এর ধরনের উপাদান হচ্ছে পূর্বপ্রবণতা, সম্ভাবনা, রূপ, বৈশিষ্ট্যাবলী ও এর সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য অপরিহার্য গঠক অংশ অর্থাৎ মধ্যবর্তী জাতিগত পৃথকীকরণ বৈশিষ্ট্য ও দূরতম জাতিগত পৃথকীকরণ বৈশিষ্ট্য সংশ্লিষ্ট বস্তুকে তার রূপ বা আকৃতি ও অব্যবহিত জাতিগত পৃথকীকরণ বৈশিষ্ট্য গ্রহণের জন্য প্রস্তুত করবে যাতে তার উৎসের উদ্ভব হয় ও তা শক্তি গ্রহণকর পর্যায়ে উপনীত হয় এবং তার অব্যবহিত জাতিগত পৃথকীকরণ বৈশিষ্ট্য হাসিল হয়। বস্তুতে অব্যবহিত জাতিগত পৃথকীকরণ বৈশিষ্ট্য হাসিল হওয়ার পর একইভাবে নতুন জাতিগত পৃথকীকরণ বৈশিষ্ট্য থেকে প্রকৃতির শক্তি ও ক্রিয়ার উদ্ভব হবে যাতে একটি শক্তি কর্তৃক ক্রিয়াটির দায়িত্ব গ্রহণ

করা হয়, অথবা উদ্ভবের উৎস থেকে উদ্ভব উদ্ভূত হবে। সুতরাং, পদার্থ এবং তার সাথে যা কিছু যুক্ত হয় অর্থাৎ মধ্যবর্তী জাতিগত পৃথকীকরণ বৈশিষ্ট্য ও দূরবর্তী জাতিগত পৃথকীকরণ বৈশিষ্ট্য বস্তুগত রূপে ও প্রাকৃতিক আকৃতির আহরক হিসেবে এবং নতুন জাতিগত পৃথকীকরণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে দেখা দেবে। আর প্রাকৃতিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ারও একটি প্রাকৃতিক রূপ আছে।

প্রাকৃতিক রূপ হচ্ছে গঠনের ক্রিয়া ও রূপের উদ্ভবমূলক ক্রিয়া ও তার আহরক। এতে যার প্রাকৃতিক রূপ অর্জিত হল তার একটি দৃষ্টান্ত (مصداق) হচ্ছে এর উদ্ভবের উৎসের বস্তুগত রূপ। তেমনি, যে কোন মধ্যবর্তী জাতিগত পৃথকীকরণ বৈশিষ্ট্য ও দূরতম জাতিগত পৃথকীকরণ বৈশিষ্ট্য– যা নতুন জাতিগত পৃথকীকরণ বৈশিষ্ট্য অর্জনের জন্য পথ তৈরি করে দিল, তারা স্বয়ংও নতুন জাতিগত পৃথকীকরণ বৈশিষ্ট্যের একই উপাদানে রয়েছে এবং 'আক্‌লী জগতের একটি উদ্ভব-উৎস তাদেরকে সৃষ্টি করেছে ও তাদেরকে তাদের নিজের বস্তুতে পরিণত করেছে। এ নতুন জাতিগত পৃথকীকরণ বৈশিষ্ট্যটি হচ্ছে সেই শক্তির ও তার আহরকসমূহেরই ক্রিয়া।

সাদরুল মোতাআল্লেহীন শীরাযী বলেন : 'আক্‌লসমূহের জগতে উদ্ভবের উৎসসমূহ নিহিত রয়েছে। এদের প্রত্যেকেই একেকটি পূর্ববর্তী জাতিগত পৃথকীকরণ বৈশিষ্ট্যের উৎস ও অর্জনের উৎস। একইভাবে বস্তুগত সত্তাসমূহের জগতে নতুন জাতিগত পৃথকীকরণ বৈশিষ্ট্য অযৌগিক। তেমনি সারের রূপসমূহ, এর বস্তুগত দৃষ্টান্তসমূহের স্বরূপ, এর শক্তি ও 'আক্‌লসমূহের জগতে এর উদ্ভব-উৎস সবই অযৌগিক এবং তা এ রূপের সকল পূর্ণতারই অধিকারী। যেহেতু তা ঘটনাবলী ও বস্তুগত সংযোজন থেকে মুক্ত সেহেতু এটি একটি অবস্তুগত 'আক্‌লী সত্তা। এভাবে আমরা পুরোপুরি প্রমাণ করেছি যে, এর প্রাকৃতিক দৃষ্টান্তসমূহের যে কোনটির স্বরূপ ও তার নতুন জাতিগত পৃথকীকরণ বৈশিষ্ট্য এর রূপের হুবহু অনুরূপ। এ রূপের উৎস হচ্ছে 'আক্বলসমূহের জগতের একটি বাস্তবতা যার সার নতুন জাতিগত পৃথকীকরণ বৈশিষ্ট্যের সাথে সংযুক্ত। আর এটিই হচ্ছে প্রাপ্তির উৎস– যাকে আদি রূপ বা প্লেটোনিক ধারণা বলা হয়।

চতুর্থ প্রমাণ (প্রমাণের সংক্ষিপ্তসার)

সন্দেহাতীতভাবে 'আক্বলী রূপসমূহের অস্তিত্ব রয়েছে। কারণ, মানুষের 'আক্লী বা বিচারবুদ্ধিগত ধারণা রয়েছে এবং এটি হচ্ছে একটি স্বতঃপ্রমাণিত বিষয়। 'আক্লী রূপসমূহ যদি স্বতঃ-অস্তিত্বশীল না হয় তাহলে তিনটি অবস্থা হতে পারে এবং তিনটি অবস্থার প্রতিটিই অসম্ভব। এ তিনটি অবস্থা হচ্ছে, প্রথমত এগুলো আমাদের এ বস্তুজগতের কোন না কোন বস্তুর ওপর নির্ভরশীল হবে। দ্বিতীয়ত এগুলো আমাদের নাফ্সের ওপর নির্ভরশীল। তৃতীয়ত তারা অন্য কোন স্বাধীন ও স্বতন্ত্র 'আক্লী সত্তার ওপর অর্থাৎ একটি অবস্তুগত সত্তার ওপর নির্ভরশীল যা 'আক্লী ধারণাসমূহের উৎসভাণ্ডার। আর যেহেতু এ তিনটি সম্ভাবনাই অসম্ভব, সুতরাং এগুলো স্বতঃ-অস্তিত্বশীল।

প্রমাণের ব্যাখ্যা

নিঃসন্দেহে আমাদের কতগুলো ধারাবাহিক 'আক্লী বিষয় রয়েছে। অর্থাৎ আমাদের সামনে এমন অনেক বিষয় আছে যা আমরা ও আমাদের মানব প্রজাতির অন্যান্য সদস্য অনুধাবন করে থাকি। আমরা এসব বিষয় সম্পর্কে অবগত এবং এসব বিষয় সম্বন্ধে আমাদের সাধারণ ধারণা রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, বিচারবুদ্ধি দ্বারা বোধগম্য মানুষ, বিচারবুদ্ধি দ্বারা বোধগম্য উদ্ভিদ ও বিচারবুদ্ধি দ্বারা বোধগম্য প্রাণী এবং এ রূপসমূহের মধ্যে বস্তুগত সত্তাসমূহের বৈশিষ্ট্য নেই; বরং এগুলো অবস্তুগত। এখন এ প্রশ্নটি আসে : এই 'আক্লী ও সর্বজনীন রূপসমূহ কি স্বতঃ-অস্তিত্বশীল, নাকি অন্যে বিদ্যমান? আর অন্যে বিদ্যমান হলে এই 'অন্য' কী?

এই 'অন্য' যদি আমাদের শরীরের কোন বস্তুগত অঙ্গ বা অংশ হয়ে থাকে– যাতে 'আক্লী রূপসমূহ বিদ্যমান, তাহলে সে ক্ষেত্রে স্বীকার করতে হবে যে, একটি অবস্তুগত 'আক্লী রূপ একটি বস্তুগত অংশ বা অঙ্গে বিদ্যমান; আর এটি অসম্ভব।

আর এই 'অন্য'– যাতে 'আক্লী রূপসমূহ বিদ্যমান, তা যদি যুক্তি প্রয়োগকারী নাফ্স্ হয়ে থাকে, তাহলে ঐ 'আক্লী রূপসমূহ নাফসের বিলয়ের আগে কখনই বিলুপ্ত হবে না এবং এ ক্ষেত্রে এগুলোর প্রতি নাফ্সের অমনোযোগিতার কোন অর্থ হয় না। অধিকন্তু, যেহেতু নাফ্স্ তার নিজের সম্পর্কে সচেতন এবং এ কারণে সে তার নিজের অস্তিত্বলাভের ঘটনা সম্পর্কে সচেতন, তাহলে এটা কী করে সম্ভব যে, কোন

ব্যক্তি তার সত্তায় (নাফ্স্) নিহিত 'আক্বলী রূপসমূহকে ভুলে যাবে? সুতরাং এ 'আক্লী রূপসমূহ কোন নাফ্সেও বিদ্যমান নেই।

কেউ হয়ত বলতে পারেন : এই 'আক্লী রূপসমূহ একটি অবস্তুগত সত্তায় বিদ্যমান– যা আমাদের নাফ্স্ থেকে স্বাধীন ও তার বাইরে অবস্থিত। আর তা হচ্ছে 'আক্ল ও তার জ্ঞানভাণ্ডার এবং 'আক্লী ধারণাসমূহ–যার সাথে নাফ্স্ কখনই সংশ্লিষ্ট নয়–উক্ত 'আক্বলী রূপসমূহ উপলব্ধি করতে পারে এবং যখন তা এ সবের সাথে সংযুক্ত না থাকে তখন তা ভুলে যায়।

জবাবে আমরা বলব যে, এ তত্ত্বে বেশ কয়েকটি ত্রুটি রয়েছে।

প্রথমত নাফ্সে বা ব্যক্তিসত্তায় 'আক্লী রূপসমূহের উদ্ভবকালে বিদ্যমান সকল সমস্যা অবস্তুগত 'আক্বলে এগুলোর উদ্ভবকালেও বিদ্যমান থাকবে।

দ্বিতীয়ত 'আক্লী মূলনীতিমালা যদি বস্তু থেকে এ প্রভাবসমূহ (রূপ ও আকৃতিসমূহ) গ্রহণ করে তাহলে এর অর্থ দাঁড়াবে এই যে, হীনতর শ্রেষ্ঠতরকে প্রভাবিত করেছে। আর এটি অসম্ভব যে, বস্তুজগৎ–যা নীচতর–'আক্বলসমূহের জগতকে প্রভাবিত করবে। আর এ প্রভাবসমূহ যদি 'আক্বল্সমূহের তুলনায় উচ্চতর জগৎ থেকে উদ্ভূত হয়ে থাকে তাহলে এর মানে হবে এক (واحد) থেকে বহুত্বের উদ্ভব হয়েছে– যা অসম্ভব।

তৃতীয়ত নাফ্স্ যখন এ রূপসমূহ সম্পর্কে চিন্তা করে তখন তা এগুলোর স্থান ও এগুলোর উদ্ভবের প্রক্রিয়া সম্পর্কেও চিন্তা করতে বাধ্য, অথচ 'আক্লী রূপসমূহ সম্বন্ধে নাফ্সের এ ধরনের উপলব্ধি নেই।

সুতরাং 'আক্লী রূপসমূহ অন্যদের মধ্যে বিদ্যমান নয়; বরং সেগুলো স্বতঃ-অস্তিত্বমান, আর প্লেটোনিক ধারণা বলতে এটিই বুঝানো হয়ে থাকে। অর্থাৎ এমন অনেক 'আক্লী রূপ রয়েছে যেগুলো স্বতঃ-অস্তিত্বমান এবং বস্তু ও তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া থেকে স্বতন্ত্র।[৩৩]

পঞ্চম প্রমাণ

এ প্রমাণে সাদরুল মোতাআল্লেহীন সারের গতিশীলতা (حرکت جوهری)-এর সাহায্যে প্লেটোনিক ধারণা প্রমাণের চেষ্টা করেছেন। তিনি দুই পন্থায় বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন, তা হচ্ছে :

প্রথম পন্থা

এটি প্রমাণিত হয়েছে যে, বস্তুগত সত্তাসমূহের সারের গতিশীলতা হচ্ছে পরিমাণগত ও বৈশিষ্ট্যগত পরিবর্তন; বস্তুগত সত্তাসমূহের বস্তুগত উপাদানে পরিবর্তন ঘটে থাকে এবং যে কোন বস্তুগত সত্তার স্বরূপ ও সারে সব সময় ও অনবরত পরিবর্তন ঘটে চলেছে। এ ক্ষেত্রে তার বস্তুগত উপাদান বলতে তার নতুন জাতিগত পৃথকীকরণ বৈশিষ্ট্য, অস্তিত্ব ও সত্তাকে বুঝায় যা পরিবর্তিত হচ্ছে এবং প্রতিটি মুহূর্তেই রূপান্তরিত হয়ে চলেছে। আর এ সারের গতিশীলতার কারণে তার সত্তার মধ্যে অন্যান্য ধরনের ঘটনাজনিত পরিবর্তনও ঘটে চলেছে।

অধিকন্তু এটি প্রমাণিত হয়েছে যে, বস্তুগত সত্তার বস্তুসমূহ স্বতঃনবায়নরত অর্থাৎ তার সার সর্বদাই রূপান্তর প্রক্রিয়াধীন এবং এ রূপান্তর তার সারের কারণেই ঘটে থাকে। তার এ রূপান্তর তার ওপর আরোপিত নয়; বরং রূপান্তর যে কোন বস্তুগত সত্তার অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যসমূহের অন্যতম। অতএব, একটি বস্তুগত সত্তার বস্তুগত উপাদানসমূহের কারণ একটি সার্বক্ষণিক বিষয়, কিন্তু এ কারণে এটি অপরিহার্য নয় যে, স্বয়ং ঐ সত্তাটিও নবায়িত হবে। কারণ, 'নবায়িতের কারণও (স্বতঃ-)নবায়িত'– এ মূলনীতিটি কেবল সে ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যেখানে নবায়নের বিষয়টি ঘটনাক্রমে সংঘটিত হয়। অন্যদিকে বস্তুগত উপাদানের বৈশিষ্ট্যই এই যে, নবায়ন তার সারের অপরিহার্য অনুষঙ্গ। কিন্তু আমাদের আলোচ্য বিষয়ে এর কারণ হচ্ছে 'আক্‌লী বিষয়। কারণ, বস্তুর ওপর নির্ভরশীল নাফ্‌স্‌কে বস্তুগত প্রকৃতি হিসেবে গণ্য করা হয়।

সুতরাং প্রতিটি বস্তুগত সত্তার ও প্রতিটি বস্তুগত প্রকৃতির কারণ হচ্ছে 'আক্‌লী প্রপঞ্চ যার একই প্রজাতির দৃষ্টান্তসমূহের এবং তার পর্যায়সমূহ ও সীমাসমূহের সাথে অভিন্ন সম্পর্ক রয়েছে। সে প্রপঞ্চটি একই সাথে যেমন তার দৃষ্টান্তসমূহের টিকে থাকার কারণ, সেই সাথে প্রজাতিসমূহের সারও বটে এবং এ কারণে তার বস্তুগত উপাদানের টিকে থাকার কারণ (অবশ্য প্রকৃতির পাশাপাশি) ও তার প্রজাতিগোষ্ঠীর পূর্ণতা দানকারীও বটে। এ বৈশিষ্ট্যগুলো প্রমাণ করে যে, এ প্রজাতিগুলোর 'আক্‌লী উপাদানের সাথে সংশ্লিষ্টতা রয়েছে যা এর এক ধরনের অবস্তুগত রূপ।

দ্বিতীয় পন্থা

গতি সংক্রান্ত আলোচনায় এটি প্রমাণিত হয়েছে যে, একটি জিনিসকে অবশ্যই অনবরত টিকে থাকতে হবে যাতে তা তার অস্তিত্বের ধারাবাহিকতা ও গতিশীলতার এককত্ব বজায় রাখতে পারে। কারণ, তার বৈশিষ্ট্যসমূহ অনবরত পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয়ে চলেছে। আর এটি জরুরি যে, একটি জিনিস তার শুরু থেকে তার গতিশীলতার শেষ পর্যন্ত পরিবর্তিত হওয়া উচিত নয়। অন্যদিকে এই অব্যাহত জিনিসটি আদি পদার্থ হতে পারে না। কারণ, আদি পদার্থের বর্গীয় এককত্ব রয়েছে এবং তার রূপ পরিবর্তনের সাথে সাথে তা রূপান্তরিত ও নবায়িত হবে। সুতরাং এই সার্বক্ষণিক জিনিসকে গতিশীলতার একত্ব সংরক্ষণকারী হতে হবে এবং প্রকৃতির বোধশক্তিকে টিকিয়ে রাখতে হবে; আর এ বিষয়টি একটি অবস্তুগত ও 'আক্‌লী বিষয়।

সুতরাং প্রকৃতির একটি সার আছে– যা হচ্ছে নবায়িত উপাদানে গঠিত– যা আদি বস্তু থেকে এসেছে এবং সেই সাথে একটি সার্বক্ষণিক 'আক্বলী উপাদান। আর এ ক্ষেত্রে প্রকৃতির সার উক্ত 'আক্‌লী উপাদানের সারের সাথে একত্র হয়। তা হয় এভাবে যে, সারসমূহ ও তাদের ক্রিয়াসমূহ একত্র হয়, অথচ তাদের একটি হচ্ছে বস্তুগত ও অপরটি 'আক্বলী।[৩৪]

সারের গতিশীলতা সম্পর্কিত আমাদের আলোচনায় আমরা উল্লেখ করেছি যে, উপাদানে গতিশীলতার কারণে সাদরুল মোতাআল্লেহীন বলেন যে, প্লেটোনিক ধারণাসমূহের অস্তিত্ব আছে এবং তিনি তাঁর *আল্-হুদূছ* নামক অভিসন্দর্ভে এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন।[৩৫]

ষষ্ঠ প্রমাণ

চতুর্থ প্রমাণের ন্যায় এটিও 'আক্‌লী ধারণাসমূহের উপলব্ধির ওপর ভিত্তিশীল, তবে এটি ভিন্ন এক বর্ণনাপদ্ধতিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সাদরুল মোতাআল্লেহীন তাঁর এ প্রমাণে মানসিক সত্তাসমূহের রূপের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন– যা প্রমাণ করে যে, তিনি আদি অনুকূল পূর্বধারণার বিষয়টি গ্রহণ করেননি যা তিনি মানসিক সত্তা সম্পর্কিত বিষয়ে অত্যন্ত অধ্যবসায়ের সাথে

আলোচনা করেছেন এবং একে সমস্যাটির একটি সমাধান রূপে গণ্য করেছেন।[৩৬] তাঁর গ্রন্থ *আশ্-শাওয়াহেদুর্ রুবুবিয়্যাহ্*-তে তাঁর মন পরিবর্তনের বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট।[৩৭]

মানসিক সত্তা সংক্রান্ত আলোচনায় এ সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং তাতে অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে যে, মানুষ যদি প্রকৃত অস্তিত্বের অধিকারী সার উপলব্ধি করে এবং এ উপলব্ধির সময় তার মনে উক্ত সার উপস্থিত হয়, তাহলে একদিকে যেমন তা হবে সার এবং একই সাথে তা হবে স্বতঃ-অস্তিত্বমান অস্তিত্ব, অন্যদিকে এটি মানুষের নাফ্সে উপস্থিত ছিল এবং এটি একটি জ্ঞান, সে হিসেবে এটির একটি ঘটনাক্রমিক অস্তিত্ব রয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, একটি সত্তা কীভাবে একটি জিনিস ও একটি ঘটনা হবে?

এ প্রমাণে মোল্লা সাদরা এ সমস্যার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং মনে হয় যেন এ প্রশ্নের কোনই জবাব নেই, আর মানসিক সত্তা সংক্রান্ত আলোচনায় এটি একটি স্বীকৃত প্রশ্ন যার ওপরে তিনি তাঁর যুক্তি প্রয়োগের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন।

তিনি ব্যাখ্যা প্রদান করেন যে, সত্তাসমূহের মধ্যে কতগুলো সত্তা প্রাকৃতিক এবং সেগুলো স্বীয় বস্তু ও ঘটনাবলীসহ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে বিদ্যমান, আর কতগুলো হচ্ছে বস্তুজাগতিক এবং সেগুলো তাদের দৃষ্টান্তসমূহ সহ ঘটনাবলীর মাধ্যমে বাস্তবে বিদ্যমান। এ দুই ধরনের ছাড়াও এমন অনেক 'আক্বলী ধারণার অস্তিত্ব রয়েছে যেগুলো বস্তু ও তার ঘটনাবলি থেকে পৃথক। আবার এমন অনেক 'আক্লী ধারণারও অস্তিত্ব রয়েছে যেগুলোতে সেসবের দৃষ্টান্তের অংশীদারিত্ব রয়েছে এবং সেগুলো স্বীয় দৃষ্টান্তসমূহের সাথে গুণাবলি হিসাবে বিদ্যমান, যে কারণে সেগুলো স্বীয় সকল দৃষ্টান্তের সাথে সহাবস্থান করে, অথচ একই সময় সেগুলো পরিবেশ-পরিস্থিতি, বস্তুগত বৈশিষ্ট্যাবলী ও দৃষ্টান্ত থেকে মুক্ত; বরং তা 'আক্লী ব্যক্তিসত্তার বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত, কারণ, 'আক্লী ব্যক্তিসত্তা ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যক্তিসত্তা পরস্পর সম্পর্কহীন হওয়া অপরিহার্য নয়।

এ ব্যাখ্যা প্রদানের পর সাদরুল মোতাআল্লেহীন শীরাযী বলেন : বস্তু থেকে মুক্ত 'আক্লী সত্তা হয় স্বয়ংসম্পূর্ণ বা স্বতঃ-অস্তিত্বমান যা অবস্তুগত প্লেটোনিক ধারণাসমূহের সাথে অভিন্ন, অথবা তা নাফ্সে বিদ্যমান থাকে, আর নাফ্স্ যখন তা উপলব্ধি করে তখন তা প্রাপ্ত হয়। অতঃপর এটি অপরিহার্য হয়ে পড়ে যে, অনভূত

প্রকৃত অস্তিত্বের অধিকারী সার নাফ্সের ওপরে সত্য বলে প্রত্যয়নকৃত একটি ঘটনা ও বৈশিষ্ট্যে পরিণত হবে, অর্থাৎ একটি সত্তা একই সাথে ঘটনাও হবে এবং প্রকৃত অস্তিত্বও হবে। (তবে যেহেতু এটি একটি অব্যাহত স্বরূপ এবং স্বীয় দৃষ্টান্তসমূহের সার সেহেতু একে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দৃষ্টান্তসমূহ না বলে প্রকৃত অস্তিত্ব বলাই অধিকতর সঠিক হবে।)

এ ধরনের বক্তব্যের জবাবে বলা হয়েছে যে, সাধারণ অস্তিত্বমান অস্তিত্ব, যেমন একটি প্রাণী; এটি একটি প্রকৃত অস্তিত্ব। কারণ, তা বাস্তব রূপ পরিগ্রহণযোগ্য; এটি যেমন প্রাণীবিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, তেমনি মনে তা প্রাণীবিশেষে সম্পৃক্ত হওয়ার সম্ভাবনার পথেও বাধা নেই। কারণ, মনে যা কিছু কোন বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত তা এ বিষয় সম্পর্কে সত্য। ফলে তা বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করলেও মানসলোকের মূল সত্তাটি হবে স্থানোর্ধ্ব। কিন্তু মোল্লা সাদরা ইবনে সীনার *আশ্-শিফা* গ্রন্থে ও অন্যান্য দার্শনিকের রচনায় উল্লিখিত এ জবাবের সমালোচনা করেছেন (তিনি মানসিক অস্তিত্ব সংক্রান্ত আলোচনায় এ দাবি খণ্ডন করেছেন)।

এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন : 'নাফ্সে যা অনুভূত হয় তা উক্ত সারের 'আক্লী রূপ নয়; বরং এ হচ্ছে একটি মানসিক বৈশিষ্ট্য যা নাফ্স্কে 'আক্লী পর্যবেক্ষণের জন্য প্রস্তুত করে যা তাকে এর সাধারণ স্বরূপ প্রদর্শন করে। এ প্রমাণে যা উল্লিখিত হল তদনুযায়ী যে কোন সারের সাধারণ স্বরূপই হবে স্বয়ংসম্পূর্ণ বা মুখাপেক্ষিতাহীন ও স্বতঃ-অস্তিত্বমান– নাফ্স্ তার উপলব্ধির সময় যা প্রত্যক্ষ করে থাকে।'[৩৮]

সপ্তম প্রমাণ

এ প্রমাণটিও পূর্ববর্তী প্রমাণের ন্যায় উপলব্ধি ও উপলব্ধিকালীন প্রক্রিয়ার সাহায্যে দাবি করা হয়েছে। এখানে যুক্তিপ্রয়োগকালে সাদরুল মোতাআল্লেহীন বিচারবুদ্ধি ('আক্ল্) ও 'বিচারবুদ্ধি দ্বারা বোধগম্য বিষয়ের' অভিন্নতার–যা তিনি ইতঃপূর্বে প্রমাণ করেছেন–আশ্রয় নিয়েছেন। পূর্ববর্তী প্রমাণে আলোচিত প্রাথমিক পর্যায়ের আলোচনার পর তিনি এ সত্য গ্রহণ করে নেন যে, অস্তিত্বে একটি 'আক্লী সত্তা বিদ্যমান, প্রকৃতপক্ষে নাফ্স্ যা উপলব্ধি করে এবং মানুষের মনে অনেক 'আক্লী সত্তা রয়েছে, প্রকৃতপক্ষে 'আক্বলে বিদ্যমান থাকার কারণেই তা 'আক্লী।

যেহেতু 'বিচারবুদ্ধি প্রয়োগকারী' (عاقل) ও 'বিচারবুদ্ধি দ্বারা বোধগম্য বিষয়ের (معقول)' ঐক্য বিষয়ক আলোচনায় এটি প্রমাণিত হয়েছে যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্তা প্রকৃতপক্ষে অনুভূতি ও ইন্দ্রিয়নিচয়ের সত্তা, অন্যদিকে প্রকৃতপক্ষে 'আক্‌লী সত্তা হচ্ছে স্বয়ং 'আক্‌ল প্রয়োগকারী সত্তাস্থ 'আক্‌লী সত্তা, আর 'আক্‌ল প্রয়োগকারী সত্তা হচ্ছে এমন একটি সত্তা যা প্রকৃতপক্ষে একটি অবস্তুগত অস্তিত্ব। এ কারণে 'বিচারবুদ্ধি দ্বারা বোধগম্য বিষয়'ও বিচারবুদ্ধি প্রয়োগকারীর ন্যায় এবং এ ধরনের অস্তিত্বের সাথে যুক্ত বিচারবুদ্ধি প্রয়োগকারী সত্তা উক্ত অস্তিত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার উপযোগী। সুতরাং কেউ যদি মানুষের সারকে বিবেচনায় নেয় ও তা অনুধাবন করে এবং তার মনে এর 'আক্‌লী ও বিচারবুদ্ধিবোধগম্য তাৎপর্য অনুভব করে তখন তার কাছে এটি সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, 'আক্‌লী জগতে মানুষের একটি 'আক্‌লী অস্তিত্ব রয়েছে। অনুরূপভাবে, যে কোন প্রাকৃতিক সত্তারই বস্তুজগতে তার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অস্তিত্বের পাশাপাশি 'আক্‌লসমূহের জগতে তার একটি 'আক্‌লী অস্তিত্ব রয়েছে।[৩৯]

এরপর মোল্লা সাদরা এ সত্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে, 'আক্‌লসমূহের জগতের প্রতিটি সারের ও প্রতিটি অবস্তুগত অস্তিত্বের একটি মাত্র দৃষ্টান্ত পাওয়া সম্ভব। (এ ব্যাপারে তিনি যে যুক্তি প্রয়োগ করেছেন তা উপস্থাপন করা এ নিবন্ধের সীমিত পরিসরে সম্ভব নয়।)

অষ্টম প্রমাণ

সাদরুল মোতাআল্লেহীন শীরাযী এ প্রমাণে প্রাকৃতিক অস্তিত্বসমূহের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াসমূহের ওপর ভিত্তি করে এ উপসংহারে উপনীত হন যে, প্লেটোনিক ধারণাসমূহ এবং পরে অস্তিত্বলাভকারী 'আক্‌লসমূহ– স্বীয় প্রজাতিসমূহের দৃষ্টান্তসমূহের সাথে যেগুলোর সম্পর্ক সমবিস্তৃত– এ উভয়েরই অস্তিত্ব রয়েছে। এ ক্ষেত্রে তিনি নিম্নোক্ত যুক্তি উপস্থাপন করেছেন :

আমরা জানি যে, বস্তুগত আদি রূপসমূহ, যেমন উদ্ভিদরাজি, তাদের প্রত্যেকেরই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া রয়েছে যা একান্তভাবে তাদের নিজস্ব, আর এসব ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে কতগুলো বিশেষ বৈশিষ্ট্য– যা তাদের প্রত্যেকের বেলায় অনবরত ঘটে থাকে। অর্থাৎ যে কোন দৈহিক রূপে যে পদার্থ রয়েছে তাতেই কিছু বিশেষ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া রয়েছে যা তাদের প্রত্যেকের জন্য একান্ত। আর এ বৈশিষ্ট্যসমূহ সৃষ্টির

বেলায় তারা স্বয়ংসম্পূর্ণ ও অনন্যনির্ভর নয় এবং তাদের পক্ষে সে ধরনের (স্বাধীন ও অনন্যনির্ভর) ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অধিকারী হওয়া সম্ভবও নয়। কারণ, বস্তুগত রূপসমূহ হচ্ছে বস্তুগত অস্তিত্ব এবং তাদের মধ্যে যদি এ ধরনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া থাকে তো তা পদার্থের সাথে সংযুক্ত। তাছাড়া এ ধরনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সংঘটিত হবার জন্য বিশেষ পরিস্থিতিও অপরিহার্য। অর্থাৎ দৈহিক রূপসমূহ যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করে তা অবশ্যই পদার্থ ও বিশেষ পরিবেশ-পরিস্থিতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। অন্যদিকে কোন দৈহিক কাঠামো যদি তার নিজের পদার্থের ওপর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করে সে ক্ষেত্রে উক্ত দু'টি শর্তের একটিও পাওয়া যাবে না। এর কারণ, প্রথমত কোন সত্তারই নিজের ক্ষেত্রে এ ধরনের অবস্থান নেই। দ্বিতীয়ত পদার্থের সাথে যুক্ত হওয়া ছাড়াই রূপের অবশ্যই নিজস্ব ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া থাকতে হবে এবং তাকে তার নিজস্ব ক্রিয়ার ক্ষেত্রে পদার্থ থেকে মুক্ত থাকতে হবে। অথচ বস্তুগত রূপ তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও অস্তিত্বের উৎস উভয়ের জন্যই পদার্থের মুখাপেক্ষী।

অতএব, আদি রূপসমূহ তাদের নিজস্ব পদার্থে গতিসঞ্চারে সক্ষম নয়। সুতরাং স্বীয় বৈশিষ্ট্যাবলী ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া প্রদর্শনের জন্য সেগুলো অন্যের ওপর নির্ভরশীল। আর এই 'অন্য' হচ্ছে হয় নাফ্স্, নয়ত 'আক্ল– যেগুলোকে অবশ্যই স্বীয় বৈশিষ্ট্যাবলীসহ সেগুলোর সাথে সংযুক্ত হতে হবে। কিন্তু নাফ্সের পক্ষে রূপসমূহের সাথে যুক্ত হয়ে তাতে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। কারণ, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও শরীরের ওপর নির্ভরশীলতার বেলায় নাফ্স্ও অন্যান্য প্রাকৃতিক রূপের অনুরূপ এবং তা দেহের অধিকারে থাকে ও দেহের ওপর নির্ভরশীল।

সুতরাং 'আক্ল হচ্ছে একমাত্র সত্তা যা প্রাকৃতিক রূপে এসব ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া যুক্ত করতে পারে এবং বিভিন্ন ধরনের বস্তুগত অস্তিত্ব থেকে যেসব ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হয়, যেমন তাপ, শীতলতা, রং, স্বাদ ইত্যাদি, সেগুলো আদি রূপ থেকে উৎসারিত নয়; বরং তা এমন বিষয় থেকে উদ্ভূত আদি রূপ যার ওপর নির্ভরশীল, আর আদি রূপের অস্তিত্বের মূল হচ্ছেন মহান স্রষ্টা। আর এ জিনিসটি (আদি রূপসমূহ) হচ্ছে বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন সত্তা যা স্বীয় দৃষ্টান্তসমূহের সবগুলোর সাথেই সমবিস্তারমূলক সম্পর্কের অধিকারী। অন্যদিকে বস্তুগত রূপগুলো আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক অস্তিত্বলোক ও তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াসমূহের উৎসে প্রতিপালিত।[৪০]

অনুবাদ : নূর হোসেন মজিদী

[১] معلم اول – অ্যারিস্টটল ।

[২] সাদরুল মোতাআল্লেহীন শীরাযী : আল-আসফার, ২য় খ-, পৃ. ৪৭ ।

[৩] দেখুন, সাদরুল মোতাআল্লেহীন শীরাযী : *হাশিয়ায়ে শার্হে হিকমাতুল্ ইশরাক্ব*, পৃ. ২৫১ ।

[৪] ইবনে সীনার বিখ্যাত গ্রন্থ ।

[৫] শাইখুল ইশরাক্ব উল্লিখিত প্রমাণসমূহ সম্বন্ধে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন : সাদরুল মোতাআল্লেহীন শীরাযী : *আল্-আস্ফার্*, ২য় খ-, পৃ. ৫৩-৬২; সোহ্রাওয়ার্দী : শাইখুল ইশ্রাক্বের রচনা সমগ্র, ১ম খ-, *আল্-মুতারিহাত্*, পৃ. ৪৫৩; *আল্-মুক্বাভিমাত্*, পৃ. ১৯১; শাইখুল ইশ্রাক্বের রচনা সমগ্র, ২য় খ-, *হিকমাতে ইশ্রাক্ব*, পৃ. ১৫৪ ।

[৬] সাদরুল মোতাআল্লেহীন শীরাযী : *আল্-আস্ফার্*, ৫ম খ-, পৃ. ১৯১ ।

[৭] و ان من شيءٍ الا عندنا خزائنه. (সূরাহ্ আল্-হিজ্র : ২১) ।

[৮] সাদরুল মোতাআল্লেহীন শীরাযী : *মাফাতীহুল্ গ্বায়ব্*, পৃ. ৪১৮ ।

[৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৮ ।

[১০] সাদরুল মোতাআল্লেহীন শীরাযী : *আশ্-শাওয়াহেদুর্ রুবুবিয়্যাহ্*, পৃ. ১৬৩ ।

[১১] সাদরুল মোতাআল্লেহীন শীরাযী : *মাফাতীহুল্ গ্বায়ব্*, পৃ. ৪৪৭ ।

[১২] প্রাগুক্ত, ৪২৪ ।

[১৩] সাদরুল মোতাআল্লেহীন শীরাযী : *আল্-আস্ফার্*, ৫ম খ-, পৃ. ২০২ ।

[১৪] واجب الوجود – Essential Existence অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ।

[১৫] দ্রষ্টব্য, কায়সারী : *শার্হে ফুছূছুল্ হিকাম্*, ভূমিকা, ৩য় অধ্যায় ।

[১৬] মোল্লা সাদরার কারণ ও ফলাফল সংক্রান্ত আলোচনা দেখুন : *আল্-আস্ফার্*, ২য় খ-, পৃ. ২৯৯ ।

[১৭] সাদরুল মোতাআল্লেহীন শীরাযী : *মাফাতীহুল্ গ্বায়ব্*, পৃ. ৪৩৬ ।

[১৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪ ।

[১৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৬ ।

[২০] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৪ ।

[২১] ما عندكُم ينفَدُ و ما عند اللهِ باقٍ. (সূরাহ্ আন্-নাহ্ল্ : ৯৬) ।

[২২] قُل لَو كانَ البحر مداداً لكلمة ربى لَنفد البحر قَبلَ أن تنفَد كلمةُ ربى و لَو جِئنا بِمثله مداداً. (সূরাহ্ আল্-কাহ্ফ্ : ১০৯) ।

[২৩] সাদরুল মোতাআল্লেহীন শীরাযী : *আল্-আস্ফার্*, ৭ম খ-, পৃ. ১৯৮ ।

[২৪] সাদরুল মোতাআল্লেহীন শীরাযী : *আল্-আস্ফার্*, ২য় খ-, পৃ. ৫৮-৬২ এবং *আশ্-শাওয়াহেদুর্ রুবুবিয়্যাহ্*, পৃ. ১৬৯-১৭১ ।

[২৫] সাদরুল মোতাআল্লেহীন শীরাযী : *মাফাতীহুল্ গ্বায়ব্*, পৃ. ৪৪৩ ।

[২৬] সাদরুল মোতাআল্লেহীন শীরাযী : *আশ্-শাওয়াহেদুর্ রুবুবিয়্যাহ্*, পৃ. ১৬৯ ।

[২৭] সাদরুল মোতাআল্লেহীন শীরাযী : *হাশিয়ায়ে শার্হে হিকমাতুল্ ইশরাক্ব*, পৃ. ৩৭৩ ।

[২৮] self-existent. এখানে স্বতঃ-অস্তিত্বশীল বলতে এটি বুঝানো উদ্দেশ্য নয় যে, 'আক্লী সত্তা আল্লাহ্ থেকে অমুখাপেক্ষী; বরং প্রবন্ধের আলোচনায় যেমন উল্লিখিত হয়েছে, যেহেতু 'আক্বলী সত্তাগুলো স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞানে অস্তিত্বশীল সেহেতু এগুলো অনাদি কাল থেকেই আছে; এগুলো আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক কালের গর্ভে সৃষ্ট নয় । তেমনি এ-ও উল্লেখ করা হয়েছে যে, এগুলো আল্লাহ্তে বিলুপ্ত হয়ে আছে এবং এ কারণে স্বীয় অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন নয়; বরং এগুলো আল্লাহ্র গুণাবলী । এ অনাদিত্বের ব্যাখ্যা সহকারেই 'আক্লী সত্তাগুলোকে স্বতঃ-অস্তিত্বশীল বলা হয়েছে ।– অনুবাদক

[২৯] সাদরুল মোতাআল্লেহীন শীরাযী : *মাফাতীহুল্ গ্বায়ব্*, পৃ. ৪৪৪ ।

[৩০] সাদরুল মোতাআল্লেহীন এই একই বিষয় তাঁর *আশ্-শাওয়াহেদুর্ রুবুবিয়্যাহ্* গ্রন্থে 'তাহ্ছীলে 'আর্শী লে-হিকমাতিল্ মাশ্রিকীয়্যাহ্' শিরোনামে আলোচনা করেছেন, কিন্তু সেখানে তিনি এ প্রমাণটি প্লেটোনিক ধারণার প্রমাণসমূহের অন্তর্ভুক্ত করেননি । কিন্তু যেহেতু তাঁর রচিত *হাশিয়ায়ে শার্হে হিকমাতুল্ ইশরাক্ব* গ্রন্থটি আরও পরবর্তীকালের রচনা সেহেতু আমরা এ সূত্রটিও ব্যবহার করেছি ।

[৩১] সাদরুল মোতাআল্লেহীন শীরাযী : *হাশিয়ায়ে শার্হে হিকমাতুল্ ইশরাক্ব* পৃ. ৩৭৩ ।

[৩২] فصل – এমন বৈশিষ্ট্য যা দ্বারা কোন প্রজাতিকে অন্য সমস্ত প্রজাতি থেকে পৃথক করে চেনা সম্ভব । যেমন, মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে পার্থক্যকরণের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, মানুষ কথা বলে । এ কারণে মানুষকে 'কথক প্রাণী' (حيوان ناطق) বলা হয় ।– অনুবাদক

[৩৩] মোল্লা সাদরা, ২য় খ-, পৃ. ৭০ ।

[৩৪] সাদরুল মোতাআল্লেহীন শীরাযী : *আশ্-শাওয়াহেদুর্ রুবুবিয়্যাহ্*, পৃ. ১৫৯; *হাশিয়ায়ে শার্হে হিকমাতুল্ ইশরাক্ব*, পৃ. ৩৭৪ ।

[৩৫] সাদরুল মোতাআল্লেহীন শীরাযী : 'রিসালাহ্ ফীল্ হুদূছ্', *রিসালায়ে মোল্লা সাদরা*, পৃ. ৩৫ ।

[৩৬] মানসিক সত্তা সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের সমাধান প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, কীভাবে জ্ঞানের মতো একটি অস্তিত্বের একদিকে জ্ঞানগত সার রয়েছে, অন্যদিকে তার এমন একটি সার থাকতে হবে যা তাত্ত্বিককরণের ওপর নির্ভরশীল হবে? তিনি আদি অনুকূল পূর্বধারণা সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন এবং তিনি তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে তাঁর এ তত্ত্বের সমর্থন

করেছেন। তিনি একে মানসিক সত্তা সংক্রান্ত সমস্যার একমাত্র সমাধান হিসাবে গণ্য করেছেন।

মোল্লা সাদরা বলেন : 'জ্ঞান হচ্ছে এমন একটি সত্তা যার সার হচ্ছে ঘটনাসমূহের মধ্যকার একটি ঘটনা এবং একটি মানসিক বৈশিষ্ট্য। এটি হয় অস্তিত্বের একটি বিশেষ ধরন মাত্র এবং এ কারণে এর কোন সার নেই, আর একই সাথে, তাত্ত্বিক ব্যবস্থার অধীন সার তার সাথে এসে একীভূত হচ্ছে, এবং এটি তার অস্তিত্বগত অপরিহার্য সীমারেখা ও সার নয়। অন্য কথায়, এ জ্ঞান উক্ত সারের দৃষ্টান্তসমূহের অন্যতম নয়; বরং কেবল এর নির্দেশক। আদি অনুকূল পূর্বধারণার ভিত্তিতে উক্ত সত্তাতে 'আক্‌লী তত্ত্ব নিহিত বিধায় কেউ 'আক্‌লী সার সম্পর্কেও অনুকূল পূর্বধারণা পোষণ করতে পারে। কিন্তু এ তত্ত্বে কিছু সমস্যা আছে যা আমাদের এ আলোচনার আওতার বাইরে।

[৩৭] দ্রষ্টব্য, সাদরুল মোতাআল্লেহীন শীরাযী : *আশ্-শাওয়াহেদুর্ রুবুবিয়্যাহ্*, পৃ. ৩১-৩৩।

[৩৮] সাদরুল মোতাআল্লেহীন শীরাযী : *আশ্-শাওয়াহেদুর্ রুবুবিয়্যাহ্*, পৃ. ১৬১।

[৩৯] সাদরুল মোতাআল্লেহীন শীরাযী : *আল্-আস্‌ফার্*, ৩য় খ-, পৃ. ৫০৬।

[৪০] সাদরুল মোতাআল্লেহীন শীরাযী : *আশ্-শাওয়াহেদুর্ রুবুবিয়্যাহ্*, পৃ. ১৬১।

(সূত্র : তেহরান থেকে প্রকাশিত ম্যাগাজিন Al-Tawhid, Volume 15, No. 4, Winter 2000 থেকে অনূদিত)

সমসাময়িক বিশ্ব

ইসলামী সন্ত্রাসবাদ :
বাস্তবতা না কি কল্পকথা

ইসলামী সন্ত্রাস : বাস্তবতা না কল্পকথা?

ডক্টর এনায়েতুল্লাহ্ ইয়াযদানি ও হুজরাত ইয়াযদি

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর রহস্যজনক ঘটনার পর যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতিতে, বিশেষ করে দেশটির মধ্যপ্রাচ্য নীতিতে বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে। মুসলমানরা এ হামলা চালিয়েছে বলে দাবি ও প্রচার করা হয় এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশ এজন্য ক্রুসেড ঘোষণা করেছিলেন। ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানসহ কোন কোন দেশ ঐ ঘটনা ঘটার পর পরই সন্ত্রাসী প্রকৃতির ঐ হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছিল।

মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন মাজহাব, গ্রুপ ও প্রবণতা সক্রিয় থাকায় কথিত ইসলামী সন্ত্রাসের ব্যাপারে আলোচনার জন্য কট্টর বা র‍্যাডিক্যাল ইসলামপন্থী ও ইসলামী পুনর্জাগরণবাদী তৎপরতাগুলোর স্বরূপ সম্পর্কে জানা দরকার। এসব প্রবণতা ও ধারার মধ্যে কোন্ ধারাটি ইসলামী সন্ত্রাসের সাথে সম্পর্কিত? মুসলমানদের 'সন্ত্রাসী' হিসাবে চিত্রিত করার ক্ষেত্রে তালেবান ও আল-কায়েদা গোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষক তথা ওয়াহাবী মতবাদ বিশেষ সহায়ক ভূমিকা রাখছে কিনা তাও আমরা বিশ্লেষণ করব।

এটা স্পষ্ট যে, পবিত্র ধর্ম ইসলাম সন্ত্রাসবাদ বা সন্ত্রাসী তৎপরতার বিরোধী।

নিউইয়র্কে বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্রের টুইন টাওয়ারে এবং পেন্টাগন ভবনে হামলার পর পাশ্চাত্যে 'জিহাদ' শব্দটির ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। কোন কোন পশ্চিমা সংবাদ ও গণমাধ্যম আল কায়েদার আর্থিক অবস্থানকে 'জিহাদিজ্‌ম' বলে উল্লেখ করছে। এ হামলার পর সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডাবলিও বুশ 'ক্রুসেড' শব্দ ব্যবহার করায় মুসলিম বিশ্ব সম্পর্কে ওয়াশিংটনের নিওকন বা নব্য রক্ষণশীলদের মনোভাব স্পষ্ট হয়। এরই আলোকে মুসলমানদের জড়িয়ে ইসলামী ফ্যাসিস্ট শব্দটিও ব্যবহার করা হচ্ছে। মার্কিন কর্মকর্তারা ও তাদের সহযোগী একদল তাত্ত্বিক ইসলামী আন্দোলনগুলোকে 'গ্রীন ফ্রন্ট' বা সবুজ আন্দোলন বলে অভিহিত করছে। এক সময় পাশ্চাত্য কমিউনিস্টদের তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী বলে প্রচার করত। আর এখন অনেকটা সে কায়দায় প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে তুলে ধরা হচ্ছে গ্রীন ফ্রন্টকে।

শীতল যুদ্ধের পর পুঁজিবাদের কর্তৃত্ব বিস্তারের জন্য কথিত উদারনৈতিক গণতন্ত্র বা লিবারেল ডেমোক্রেসির একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হিসাবে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া জোরদারের প্রবণতা লক্ষণীয়। একই সাথে পশ্চিমা সভ্যতা নিজের অভ্যন্তরীণ সংহতি ধরে রাখার জন্য বিজাতীয় শত্রুর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। আর এ শত্রু হিসাবেই বেছে নেওয়া হয়েছে ইসলামকে। ফুকোয়ামার নিম্নোক্ত বক্তব্য এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য : 'ইসলাম একটি রাষ্ট্রীয়, সুশৃঙ্খল ও স্বচ্ছ আদর্শ। এর রয়েছে সুনির্দিষ্ট নৈতিক বিধান এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার সম্পর্কে স্পষ্ট বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি। ইসলামের আবেদন ও আকর্ষণ অত্যন্ত জোরালোভাবে বৈশ্বিক বা আন্তর্জাতিক। কারণ, এ ধর্মের দৃষ্টিতে সকল মানুষই সমান। প্রকৃতপক্ষে ইসলাম বিশ্বের এক বিশাল অংশে লিবারেল ডেমোক্রেসির ওপর বিজয়ী হয়েছে এবং লিবারেল ব্যবস্থাগুলোর জন্য ইসলাম খুবই মারাত্মক হুমকি। এমনকি যেসব মুসলিম দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতায় ইসলাম অনুপস্থিত, সে সব দেশেও ইসলাম এক মারাত্মক হুমকি।'

মার্কিন চিন্তাবিদ হান্টিংটনও ইসলামী ও পশ্চিমা সভ্যতা বা জীবনাদর্শের মধ্যে দ্বন্দ্ব অব্যাহত থাকবে বলে উল্লেখ করেছেন। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ'র সাবেক প্রধান জেম্‌স ওলসি এ দুই সভ্যতার দ্বন্দ্বকেই 'চতুর্থ বিশ্বযুদ্ধ' বলে অভিহিত করেছেন।

১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর বিশ্ব রাজনীতিতে সন্ত্রাসবাদবিরোধী কথাবার্তা (পশ্চিমা নেতাদের মুখে, বিশেষ করে মার্কিন ও ব্রিটিশ সরকারের মুখে) যতটা জোরদার হয়েছে অতীতে আর কখনও এমনটি দেখা যায়নি; বরং এর আগে সন্ত্রাসী অনেক দল ও গোষ্ঠী বৃহৎ শক্তিগুলোর আর্থিক, সামরিক ও নৈতিক সমর্থনও পেয়েছে। ২০০১ সালের ২৮ সেপ্টেম্বরে মাত্র তিন মিনিটের মধ্যে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে বৈশ্বিক বা আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ বিরোধী ১৩৭৩ নম্বর প্রস্তাব অনুমোদন করা সম্ভব হয়। ২০০৩ সালে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআই ২৮টি দল বা সংগঠনকে সন্ত্রাসী বলে ঘোষণা দেয়। এসব দল বা সংগঠনের মধ্যে ১৮টি দল বা সংগঠনই মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক। হোয়াইট হাউজ এ সময় থেকেই ইসলামী র‍্যাডিক্যালিজ্‌মকে বৈশ্বিক সমস্যা হিসাবে প্রচার করতে থাকে এবং এর মোকাবিলা করাকেই সার্বিক সমাধান বলে সিদ্ধান্ত নেয়। হোয়াইট হাউজের দৃষ্টিতে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের

সময় যেভাবে ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদ এবং শীতল যুদ্ধের সময় কমিউনিজম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শত্রু হিসাবে বিবেচিত হয়েছে, তেমনিভাবে ইসলামী ফ্যাসিবাদ ও ইসলামী সন্ত্রাসবাদ এ দেশটির জন্য প্রধান চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। আর ইসলামী ফ্যাসিবাদ ও ইসলামী সন্ত্রাসবাদের হোতা বা মদদাতা হচ্ছে প্রথম সারিতে আফগানিস্তান, ইরাক, ইরান, সিরিয়া ও লেবানন এবং দ্বিতীয় সারিতে রয়েছে সুদান, লিবিয়া ও ফিলিস্তিন স্বশাসন কর্তৃপক্ষ। বল প্রয়োগ করে এসব দেশের সরকার পরিবর্তন করা মার্কিন সরকারের কাছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব বা প্রাধান্য পাচ্ছে। বিশেষ করে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান যুক্তরাষ্ট্রের কাছে রাজনৈতিক ইসলামের মূল কেন্দ্র বা অক্ষ হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে। তাই ইরানের ইসলামী সরকারকে উৎখাত করাই মার্কিন পদক্ষেপ বা পকিল্পনাগুলোর চূড়ান্ত লক্ষ্য।

মার্কিন সরকার সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নামে প্রথম পর্যায়ে ২০০১ সালে আফগানিস্তানে হামলা চালিয়ে তা দখল করে নেয় এবং আল কায়েদা ও এ সংগঠনের নেতা উসামা বিন লাদেনকে নির্মূলের চেষ্টা চালায়। ফলে পতন ঘটে তালেবান সরকারের এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে আল কায়েদা। তালেবানদের পতনে উৎসাহিত বুশ আগেভাগেই হামলা বা অগ্রিম প্রতিরক্ষার নীতি গ্রহণ করে ইরাকে হামলা চালায় ও সাদ্দাম সরকারকে উৎখাত করে। হোয়াইট হাউজ এ যুদ্ধকে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় পর্যায় বলে অভিহিত করে। যুক্তরাষ্ট্র কথিত সন্ত্রাসবিরোধী লড়াইয়ের তৃতীয় পর্যায়ে মধ্যপ্রাচ্যের ইসলামী দলগুলো ও তাদের মদদদাতা দেশগুলোর বিরুদ্ধে সংগ্রামের নীতি ঘোষণা করে। ফুকোয়ামা এক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রকে রাজনৈতিক হাতিয়ার ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছেন। অনেক বিশ্লেষক মনে করেন লেবাননের হিজবুল্লাহ্, ফিলিস্তিনের হামাস ও ইসলামী জিহাদের মতো দলগুলোকে সামরিক উপায় ছাড়াও রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক দিক থেকেও মোকাবিলার কৌশল নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। কারণ, এসব দলের রয়েছে ব্যাপক জনসমর্থন। তবে ইসরাইলের লিকুদ দলের নেতারা হিজবুল্লাহ্ বা হামাসের বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপ নিতে মার্কিন সরকারকে উস্কানি বা উৎসাহ দিয়ে এসেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের নব্য রক্ষণশীলরা কথিত মৌলবাদী আন্দোলনগুলোর মধ্যে শিয়া মুসলমানদের প্রভাবকে গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর বা চালিকাশক্তি বলে মনে করে। ১৯৭৯ সালে সংঘটিত ইরানের ইসলামী বিপ্লবকে পশ্চিমা তাত্ত্বিক ও চিন্তাবিদরা 'মৌলবাদী'

বলে অভিহিত করেছে। ইরানকে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডাবলিও বুশের পক্ষ থেকে 'এক্সিস অব ইভিল' বা দুষ্কৃতির অক্ষ বলে অ্যাখ্যা দেওয়ার অন্যতম কারণ ছিল এ বিষয়টি। নিউ কনজারভেটিভ বা নিওকনদের মতে, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান মজলুম ফিলিস্তিনীদের এবং লেবাননের গণপ্রতিরোধ আন্দোলন হিযবুল্লাহ্‌কেও সহায়তা দেয়। আফগানিস্তানের শিয়ারাও দেশটির সহায়তা পায়। তাই তাদের দৃষ্টিতে মৌলবাদী আল কায়েদা ও ইরানের মধ্যে কোন তফাৎ নেই।

এভাবে ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনা ব্যবহার করে গোটা ইসলামী জাহানকেই তারা সন্ত্রাসী বলে অভিহিত করছে। কিন্তু ইসলাম কি সন্ত্রাসবাদ বা অন্যায় হত্যাকাণ্ড সমর্থন করে?

ইসলামী সন্ত্রাসবাদ বাস্তবতা, না অলীক কল্পনা?

ভয় দেখিয়ে বা ত্রাস সৃষ্টি করে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের চেষ্টাকেই বলা হয় সন্ত্রাসবাদ। বিরোধীদের দমনের জন্য বা তাদের ভীত-সন্ত্রস্ত করার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে সহিংস বা অবৈধ তৎপরতাও সন্ত্রাসবাদ হিসাবে বিবেচিত হয়। এ দ্বিতীয় ধরনের পদক্ষেপকে বলা হয় রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস। ইসলাম গোপনে কাউকে হত্যা করা বা সন্ত্রাসী পদক্ষেপকে নিষিদ্ধ করেছে। সূরা কাহ্‌ফ, সূরা মায়েদা ও বনি ইসরাইলে নরহত্যাকে নিষিদ্ধ বলে জানানো হয়েছে। যেমন, সূরা মায়েদার ৩২ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, 'এ কারণেই আমি বনি ইসরাইলের প্রতি এ বিধান দিয়েছি যে, কেউ প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ অথবা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করা ছাড়া কাউকে হত্যা করে সে যেন সব মানুষকেই হত্যা করে। আর যে কারও জীবন রক্ষা করে, সে যেন সবার জীবন রক্ষা করে। আমার পয়গম্বরগণ বনি ইসরাইলের কাছে স্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে এসেছে। বস্তুত এরপরও তাদের অনেক লোক পৃথিবীতে সীমালঙ্ঘন করেছে।'

সূরা বনি ইসরাইলের ৩৩ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, 'সে মানুষকে হত্যা কর না যাকে হত্যা করা আল্লাহ্‌ হারাম করেছেন; কিন্তু বৈধ কারণে হত্যা করা ন্যায়সঙ্গত। যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে নিহত হয়, আমি তার উত্তরাধিকারীকে হত্যার বদলা নেওয়ার বা কাসাসের ক্ষমতা দান করি। অতএব, সে যেন হত্যার ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন না করে। নিশ্চয় সে সাহায্যপ্রাপ্ত।'

আবু সাবাহ্ কানানী নামের এক ব্যক্তি হযরত ইমাম জাফর সাদেক (আ.)-কে জিজ্ঞাসা করেন, 'আমার এক প্রতিবেশী আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী (আ.) সম্পর্কে খারাপ কথা বলে, তার ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা নেওয়ার অনুমতি দেবেন কি?' তিনি বললেন, 'তুমি কি কিছু করতে পারবে?' সে বলল, 'আল্লাহ্র কসম! আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে তার আশপাশে কোথাও গোপনে অবস্থান নেব এবং নাগালের মধ্যে আসা মাত্রই তরবারি দিয়ে তাকে হত্যা করব।' ইমাম তাকে বললেন, 'হে আবু সাবাহ! তোমার এ কাজ তো গুপ্তহত্যা বা সন্ত্রাস এবং আল্লাহ্র রাসূল (সা.) তা নিষেধ করেছেন। ইসলাম অবশ্যই গুপ্ত হত্যা বা সন্ত্রাসের বিরোধিতা করে।'

মাসুম ইমামগণ থেকে বর্ণিত হয়েছে, ঈমান গুপ্তহত্যা বা সন্ত্রাসে বাধা দেয়। একজন মুমিন কখনও সন্ত্রাসে বা গুপ্ত হত্যায় জড়িত হয় না।'

পবিত্র কুরআনের এসব আয়াত ও এসব নির্ভরযোগ্য হাদীস থেকে বোঝা যায়, একজন খুনী, অপরাধী বা হত্যার যোগ্য অপরাধী বা কাফির সেনাকে কেবল ন্যায়পরায়ণ ইমাম বা তাঁর বিশেষ প্রতিনিধি অথবা ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধানের অনুমতি সাপেক্ষে তদন্ত ও সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে বিচার অনুষ্ঠানের পর প্রকাশ্যে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যায়। এক্ষেত্রে তদন্ত ও বিচার কাজও হতে হবে প্রকাশ্যে বা কোন রাখ-ঢাক ছাড়াই। এ ধরনের শাস্তির উদ্দেশ্য হল, সমাজে শৃঙ্খলা বিধান ও জনসাধারণের নিরাপত্তা ফিরিয়ে আনা। অন্যদিকে সন্ত্রাসী তৎপরতা চালানো হয় রাজনৈতিক স্বার্থ উদ্ধারের লক্ষ্যে। জননিরাপত্তা ও জনগণের শান্তি-শৃঙ্খলায় ব্যাঘাত ঘটানোর উদ্দেশ্যেও গোপনে এ ধরনের হামলা চালানো হয়। কোন ইমাম এ ধরনের তৎপরতার অনুমতি দেননি।

মহান আল্লাহ্ সূরা নিসার ৮৬ নম্বর আয়াতে বলেছেন, 'যারা ঈমান এনেছে তারা আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করে; আর যারা কাফির তারা তাগুতের (শয়তানের) পথে লড়াই করে; তাই তোমরা জিহাদ করতে থাক শয়তানের পক্ষাবলম্বনকারীদের বিরুদ্ধে, (দেখবে,) শয়তানের ষড়যন্ত্র একান্তই দুর্বল।'

ইসলামী জিহাদের উদ্দেশ্য হল, দুর্বল, বঞ্চিত ও নিপীড়িত লোকদের কুফ্রি বা তাগুতি শক্তির হাত থেকে মুক্ত করা। শিয়া রাজনৈতিক ফিকাহ শাস্ত্রে সন্ত্রাস বলতে ভয় দেখানোর জন্য অস্ত্র ব্যবহার, প্রতিপক্ষকে অসচেতন বা অসতর্ক অবস্থায় হত্যা করা এবং শত্রুকে আশ্রয় দেওয়ার পরও হত্যা করা বা তার ওপর নির্যাতন করাকে

বোঝায়। গোপন প্রতিহিংসা ও অযৌক্তিক বা অন্ধ-বিদ্বেষ এ ধরনের তৎপরতায় প্রেরণা যোগায়। শিয়া ফিকাহ অনুযায়ী এ ধরনের তৎপরতা তথা সন্ত্রাস পবিত্র কুরআনের স্পষ্ট নির্দেশ ও রাসূল (সা.)-এর সুন্নাতের খেলাফ।'

পাশ্চাত্যের বিশিষ্ট ইসলাম বিশেষজ্ঞ বার্নার্ড লুইসও মনে করেন ইসলাম খুব স্পষ্টভাবে সন্ত্রাসবাদের বিরোধিতা করে। এমনকি ইসলাম আত্মহত্যারও বিরোধিতা করে। ইসলামের যুদ্ধনীতি মোতাবেক সব অবস্থাতেই শিশু, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ও বেসামরিক মানুষকে যুদ্ধের সময় নিরাপত্তা দিতে হবে। ইসলামের দৃষ্টিতে রাসায়নিক ও পরমাণু বোমার মতো গণবিধ্বংসী অস্ত্র ব্যবহারও হারাম। বার্নার্ড লুইস বলেছেন, 'ঐতিহ্যবাহী ধারার ইসলামী আইন অনুযায়ী ফতোয়া দেওয়ার যোগ্যতা উসামা বিন লাদেনের নেই। কারণ, তিনি আলেম নন। বিন লাদেনের ফতোয়া দেওয়া হিটলার কর্তৃক পোপ নিয়োগ দেওয়ার কিংবা লেনিনের মাধ্যমে রাশিয়ার অর্থডক্স গীর্জায় নির্দেশনামা জারি করার সমতুল্য।...

পবিত্র কুরআন ও হাদীসে সন্ত্রাস নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও তালেবান ও আলকায়দার মতো দলগুলো মুসলিম বিশ্বে আত্মঘাতি হামলা চালিয়ে বা বোমা হামলা চালিয়ে নিরপরাধ ও বেসামরিক মুসলমানদের হত্যা করছে। আর এসব কাজে কুরআন ও হাদীসের সমর্থন রয়েছে বলে দাবি করেছে। আসলে এটা সঠিক বাক্যকে ভুল কাজে ব্যবহারের দৃষ্টান্তের মতো।

'জিহাদ ধর্মের অন্য কাজগুলোর চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ'– এমন মত দেওয়া হয়েছে লেখক ইবনে তাইমিয়ার আসসিয়াসাত আশ শারিয়া গ্রন্থে। উগ্র ইসলামপন্থী মৌলবাদীরা ওয়াহাবীদের সৃষ্ট নানা বিদ'আতে প্রভাবিত হয়েছেন। আর এরই আলোকে অনেকে ইসলামী সন্ত্রাসের ওপর তত্ত্ব বা থিওরি দাঁড় করাচ্ছেন। এসব তত্ত্বের না আছে বুদ্ধিবৃত্তিক বা যৌক্তিক ভিত্তি, না আছে কুরআন বা হাদীসের বর্ণনার সমর্থন। ফলে পবিত্র জিহাদ বা ইসলামী জিহাদ যে সন্ত্রাসের বিরোধী সেই ধারণা ধোঁয়াশাযুক্ত বা অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আসলে ইসলামের নামে প্রচলিত যেসব ধারা ইসলামের মূল চেতনা তথা তাওহীদের চেতনার সাথে সমন্বিত নয় সেসব ধারা আধুনিক মতবাদগুলোর খপ্পরে পড়বে, এটাই স্বাভাবিক। অতি উগ্র ইসলামী মৌলবাদীদের ক্ষেত্রে সেটাই ঘটেছে। আল কায়েদার 'পছন্দের ইসলামে' লক্ষ্য পূরণের হাতিয়ার হিসাবে সন্ত্রাস সমর্থনযোগ্য। অথচ প্রকৃত ইসলামে সৎ বা অসৎ যে

কোন উদ্দেশ্যে সন্ত্রাস বৈধ নয়। পবিত্র কুরআনের অনেক আয়াত, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর তৎপরতা ও পবিত্র ইমামগণের বর্ণনা থেকে এ বিষয়টি দিবালোকের মতই স্পষ্ট।

ইসলামে জিহাদের ধারণা

ইসলামে জিহাদ কারও কারও দৃষ্টিতে কেবল প্রতিরক্ষামূলক ও প্রাথমিক। প্রাথমিক জিহাদকেই অনেকে প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ বলে মনে করেন। আবার কেউ কেউ এ ধরনের জিহাদকে পথ নিষ্কণ্টক করার জিহাদ বলে মনে করেন। বিজাতীয়রা যদি ইসলামী রাষ্ট্রে হামলা চালায় তখন এ ধরনের প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ ফরয হয়ে পড়ে। বিজাতীয়দের হামলা যদি সাংস্কৃতিক হয় বা প্রচারণাগত হয় এবং এসবের প্রভাবে যদি সমাজে মূর্তিপূজা ও শির্ক প্রচলিত হয় তাহলে একত্ববাদকে রক্ষার জন্য বিদ্রোহ করা যায় বলে অনেকে মনে করেন। আর এ ধরনের জিহাদের চেতনাও মূলত প্রতিরক্ষামূলক এবং এ ধরনের জিহাদকে প্রাথমিক হিজাদ বলে তাঁরা উল্লেখ করেছেন।

ব্যাপকতর অর্থে আল্লাহর রাস্তায় যে কোন প্রচেষ্টাই জিহাদ। ইসলামের দৃষ্টিতে একজন মুসলমানের পুরো জীবনটাই জিহাদী জীবন। সৎ কাজ করা ও পাপ বা মন্দ থেকে দূরে থাকার জন্য প্রচেষ্টা চালানো জরুরি। ইসলামের দৃষ্টিতে ধর্মীয় ও পার্থিব বা দুনিয়াবী কাজকর্ম পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। তাই মুমিনের পুরো জীবনটাই জিহাদ। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে : 'ধর্মের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদের দেশ থেকে বের করেনি, তাদের সাথে সদাচরণ ও ইনসাফ করতে আল্লাহ্ তোমাদের নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ্ ইনসাফকারীদের ভালবাসেন। আল্লাহ্ কেবল তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন, যারা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তোমাদের দেশ থেকে বিতাড়িত করেছে এবং এ কাজে সহায়তা করেছে। যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে তারাই জালেম।'

শিয়া মুসলমানদের সমস্ত ফিকাহ্ ও সুন্নী মুসলমানদের বেশিরভাগ ফিকাহ, বিশেষ করে বর্তমান যুগে কেবল প্রতিরক্ষামূলক জিহাদকেই সমর্থন করে। সুন্নী আলেম মুহাম্মাদ শালতুতের ফতোয়াও এর দৃষ্টান্ত।

খ্রিস্টীয় ১২৫৮ সালে মোঙ্গলরা বাগদাদ দখল করে। ফলে মুসলিম বিশ্বের ওপর বাগদাদের কয়েক শতকের কর্তৃত্বের অবসান ঘটে। এ অবস্থায় ওয়াহাবী মতবাদের প্রধান পূর্বসূরি বা পথিকৃৎ ইবনে তাইমিয়া মোঙ্গল শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। তাঁর মতে মোঙ্গলরা ইসলামের সীমানা লঙ্ঘন করেছিল। তিনি জিহাদকে হজ্জ ও নামাযের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করেন এবং যারা জিহাদে অংশ নেবে না তারা কালেমা শাহাদাত উচ্চারণকারী হওয়া সত্ত্বেও কাফির ও তাদের সাথে যুদ্ধ করতে হবে বলে তিনি ঘোষণা করেন।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৭৯ সালে আফগানিস্তানে হামলা চালিয়ে দেশটি দখল করে নেওয়ার পর ইসলামী উগ্রপন্থীদের জিহাদী ও রাজনৈতিক তৎপরতায় বড় ধরনের পরিবর্তন বা গতিশীলতা দেখা দেয়। পরবর্তীকালে এরই ভিত্তিতে ধর্মীয় সহিংসতাও দানা বাঁধে।

ইসলামী জাগরণবাদী রাজনৈতিক ধারার মধ্যে দু'টি দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট। একটি হচ্ছে কট্টর বা উগ্র ইসলামী মৌলবাদী দৃষ্টিভঙ্গি এবং অন্যটি শিয়া মুসলমানদের ইসলামী বিপ্লব। এ দুই ধারা সম্পর্কে এখন আমরা আলোচনা করব।

ইসলামী মৌলবাদ

ইসলামী মৌলবাদ বলতে মূলত ইসলামের মূলনীতির দিকে ফিরে যাওয়াকে বোঝানো হয়। বিংশ শতকের শুরুর দিকে যুক্তরাষ্ট্রে প্রোটেস্টান্ট আন্দোলনের ঘরোয়া বিতর্কে ফান্ডামেন্টালিজ্‌ম বা মৌলবাদ শব্দের ব্যবহার শুরু হয়েছিল। বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইয়াহুদী, ইসলামী, বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মের কিছু ধারা জোরদার হয়ে ওঠে। এ ধারাকে পিটরাল বার্গার ধর্মনিরপেক্ষতাবিরোধী ধারা বলে উল্লেখ করেছেন। এ সময় থেকেই মৌলবাদ বা মৌলবাদী শব্দটির ব্যবহার বাড়তে থাকে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ও বিশেষ করে ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর থেকে এ শব্দের ব্যবহার আরও ছড়িয়ে পড়ে। এ পর্যায়ে হান্টিংটন ও বার্নার্ড লুইসের মতো কোন কোন চিন্তাবিদ এ তত্ত্ব তুলে ধরেন যে, ভবিষ্যতের দ্বন্দ্ব বা সংঘাত হবে ইসলাম ও পাশ্চাত্যের মধ্যে।

ইসলামী মৌলবাদ স্যেকুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে পশ্চিমা সভ্যতার অবদান বলে মনে করে এবং উপনিবেশবাদী শক্তিগুলো এ মতবাদকে মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে

দিয়েছে বলে মনে করে। ইসলামী মৌলবাদ ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে সুদৃঢ় বন্ধনের কথা বলে। মিশরের মুসলিম ব্রাদারহুডের প্রতিষ্ঠাতা হাসান আল বান্না ধর্ম ও রাজনীতিকে অবিচ্ছেদ্য বলে উল্লেখ করেছেন। জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা ও পাকিস্তানের ধর্মীয় সংস্কারক সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদুদী বিশ্বাস করতেন যে, ইসলাম মানুষ ও সামাজিক জগতের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং কর্তৃত্বশীল রয়েছে। মিশরের ইসলামপন্থী নেতা সাইয়্যেদ কুতুবও ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে বন্ধন বা সম্পর্কের প্রতি বৈপ্লবিকভাবে সমর্থন দিয়েছেন।

মুসলমানদের ক্ষেত্রে মৌলবাদী শব্দটির ব্যবহার শুরু হয়েছে বিভ্রান্তিকর অর্থে। মৌলবাদ-সংশ্লিষ্ট নয় এমন অনেক বৈশিষ্ট্য বা উপাদানকে এর সাথে সংশ্লিষ্ট করা হয়েছে। যাই হোক, কথিত 'মৌলবাদী বা জাগরণবাদী' ধারাগুলোর মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরা উচিত। পাশ্চাত্য র‍্যাডিক্যাল বা কট্টর ইসলামপন্থী বলতে এমন মুসলমানদের বোঝায় যারা রাজনীতিতে ধর্মীয় মূল্যবোধের হস্তক্ষেপের সমর্থক এবং অতি মাত্রায় ফাংশনালিস্ট। এদেরকে উগ্র মৌলবাদী বলেও অভিহিত করা যেতে পারে। এ ধারার অনুসারী মুসলমানরা ধর্মের অন্য যে কোন অংশের চেয়ে জিহাদকে বেশি গুরুত্ব দেয় এবং কোন ধরনের হতাশাবোধকে তারা সহ্য করে না। ইসলামী জাগরণবাদী বলতে যাদের বোঝায় তারাও রাজনীতি ও ধর্মের সম্পর্ককে স্বীকার করে, তবে এসব ইসলামপন্থী সবাই একই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করেন না। পুরনো ইসলামী প্রথা বা ঐতিহ্যপন্থীদের সাথে কট্টর ইসলামপন্থীদের মিল থাকলেও তাদের মধ্যে মৌলিক তফাৎও রয়েছে। ধর্মের মূল স্পিরিট বা চেতনার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া ও শুধু ধর্মের বাহ্যিক দিককে গুরুত্ব দেওয়ার বিরোধিতা ইসলামী প্রথা বা ঐতিহ্যপন্থীদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। এ ধরনের ঐতিহ্যপন্থীদের অন্যতম হলেন রেনে গেনন, এফ শোয়ান, অধ্যাপক সাইয়্যেদ হাসান নাস্‌র প্রমুখ। এ দুই ধারার মধ্যে প্রধান মিল ও অমিলগুলো হল : উভয় ধারাই আধুনিকতার বা আধুনিকতাবাদের বিরোধী, তবে কট্টর ইসলামপন্থীরা আধুনিকতার বাস্তবতা সম্পর্কে অসচেতন। এরা মূল উৎসের দিকগুলো ও এর পরিণাম সম্পর্কে তেমন মাথা ঘামায় না। তারা মনে করে, আধুনিক যুগে ধর্ম ও নৈতিকতায় বিচ্যুতি সৃষ্টি হয়েছে। কট্টর ইসলামপন্থীদের আধুনিক যুগের সূচনার দিকের ক্যাথলিকদের সাথে তুলনা করা যায়। আধুনিকতার ব্যাপারে ক্যাথলিকদের ওই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে ত্রয়োদশ পোপ লুই বিশেষ কিছু ফতোয়া জারি করেছিলেন। অন্য কথায় আধুনিকতার ব্যাপারে এদের দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট

নয়। একদিকে তারা আধুনিকতাকে শয়তানের কাজ বলে মনে করে; অন্যদিকে আধুনিকতার সুফল পুরোপুরি ভোগ করে যাচ্ছে। কিন্তু ঐতিহ্যপন্থীরা আধুনিকতাকে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু বলে মনে করে এবং তারা বর্তমান যুগে এ সম্পর্কে বিশ্লেষণ করাকে জরুরি বলে ভাবে।

প্রতিটি ধর্মেরই রয়েছে তিনটি দিক : শরীয়ত, তরীকত ও হাকীকত। কট্টর ইসলামপন্থীরা কেবল ধর্মীয় বিধান বা শরীয়তের বাহ্যিক দিকগুলোর ওপরই গুরুত্ব দেয়, অন্যদিকে ঐতিহ্যপন্থীরা ধর্মের তরীকতের দিকগুলোকে শরীয়তের চেয়েও বেশি গুরুত্ব দেয় এবং এজন্যই তারা ধর্মের ভাষাকে প্রতীকী মনে করে ও এসবের সুপ্ত অর্থ রয়েছে বলে ধারণা করে।

রাজনৈতিক তৎপরতার ক্ষেত্রেও উগ্র মৌলবাদীরা যখন ধর্মের কথা বলে, তখন তারা ধর্ম বলতে শরীয়তকেই বোঝায় এবং যখন শরীয়তের কথা বলে তখন মূলত তাদের পছন্দনীয় বিধি-বিধানগুলোকেই প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। এদের মতে ইসলাম ধর্মের সবচেয়ে বড় মূলনীতি হল, সৎ কাজের আদেশ, আর অসৎ কাজের নিষেধ বা প্রতিরোধ। কল্যাণকামিতার যুক্তিতে তারা এ তৎপরতা চালায় না; বরং তাদের এ তৎপরতা হাত ও মুখের ভাষাতেই সীমিত। অন্যদিকে ঐতিহ্যপন্থীরা একদিকে সুলুক বা খোদাপ্রেমের পথিক ও অন্যদিকে জিহাদেও সক্রিয়।

কট্টর মৌলবাদীরা প্রথম থেকেই ব্যাপক সহিংসতা ও সন্ত্রাসের সমর্থক ছিল। গত শতকের ৯০-এর দশকের পর থেকে মাজহাবী বা ফেরকাগত সহিংসতা জোরদার হয়ে ওঠে।

ইসলামী মৌলবাদ, সন্ত্রাসবাদের আত্মপ্রকাশ ও মাজহাবী বা ধর্মীয় সহিংসতা

আরব বিশ্বের পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলে রাজনৈতিক ইসলামের চর্চা সবচেয়ে বেশি হচ্ছে। অন্যান্য আরব অঞ্চলও এতে প্রভাবিত হচ্ছে। মিশর ও সৌদি আরব এরকম দু'টি অঞ্চলের দৃষ্টান্ত। এ দুই অঞ্চলেই বিংশ শতাব্দীর ২০-এর দশকে ব্যাপক মাত্রায় ইসলামী রাজনৈতিক ধারা বা আন্দোলন গড়ে ওঠে। এসব আন্দোলন আশপাশের আরব দেশগুলোকেও প্রভাবিত করেছে।

গত তিন দশকে উগ্র মৌলবাদ ও সহিংসতার মাত্রা তীব্রতর হয়েছে। ষাটের দশকের শেষের দিকে ও সত্তরের দিকে আরব বিশ্বের পশ্চিমাঞ্চলে সাইয়্যেদ কুতুবের লেখার প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে ইসলামপন্থী গ্রুপগুলো ইসলামী র‍্যাডিক্যালিজ্‌মকে জোরদার করে। এ গ্রুপগুলো সে সময় আরব বিশ্বের সরকারগুলোর বিরুদ্ধে মারমুখী হতে চেয়েছে। আশির দশকের শেষের দিকে মিশরের ইসলামী গ্রুপগুলো দেশটির সরকারী নেতাদের হত্যা করার ও শারীরিক হামলার পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এ সময় তাদের কর্মী ও সমর্থকরা পুলিশের সাথে রাস্তায় রাস্তায় ব্যাপক সংঘর্ষে লিপ্ত হয়।

গত ৭০-৮০ বছরে ইসলামী আন্দোলনগুলো অনেক চড়াই-উৎরাইয়ের সম্মুখীন হয়েছে। এ সময়ে অর্থাৎ মুসলিম ব্রাদারহুড বা ইখওয়ানুল মুসলিমিন সংগঠন গড়ে ওঠার পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত তিন ধরনের সহিংসতা দেখা গেছে। এক. প্রতিক্রিয়ামূলক সহিংসতা। দুই. আদর্শিক বা মতাদর্শগত সহিংসতা। তিন. মাজহাবী বা ফেরকাগত সহিংসতা। প্রতিক্রিয়ামূলক সহিংসতা ঘটেছে ১৯৪০ থেকে ১৯৬০-এর দশকে সরকারগুলোর দমন নীতির জবাবে। মতাদর্শগত সহিংসতা ঘটে ১৯৬০ থেকে ১৯৮০-এর দশকে রাজনৈতিক সরকারগুলোকে উৎখাতের লক্ষ্যে। তৃতীয় পর্যায়ের সহিংসতা লক্ষ্য ও হতাহতের দিক থেকে প্রথম এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের সহিংসতার তুলনায় খুবই ব্যাপক। বহু নিরপরাধ ও সাধারণ মানুষ এ শেষোক্ত সহিংসতায় উগ্র ইসলামপন্থীদের হাতে নিহত হয়েছে।

আরব উপদ্বীপ (জাজিরাতুল আরব) ও তার আশপাশের অঞ্চলে ওয়াহাবীরা অন্যদের চেয়ে নিজেদের উন্নত মুসলমান বলে মনে করে। এরা অন্য মুসলমানদের, বিশেষ করে শিয়া মাযহাবের অনুসারীদের বিশ্বাস ও চিন্তাধারার কঠোর বিরোধী। তারা শিয়াদের শুধু বিদ'আত বা কুপ্রথাপন্থী বলেই মনে করে না, একই সাথে তাদের ওপর হত্যাযজ্ঞ, নির্মূল অভিযান ও তাদের পবিত্র ধর্মীয় কেন্দ্রগুলোকেও ধ্বংস করার পদক্ষেপ নিয়েছে। উনিশ শতকের শেষের দিকে ও বিশ শতকের প্রথম দিকে ইরাকে অবস্থিত মুসলমানদের পবিত্র স্থানগুলোর ওপর হামলা চালায় ওয়াহাবীরা। তারা সেখানে হত্যাযজ্ঞ চালায় ও ইমামগণের মাজার ধ্বংস করে। ১৯৯৭ সালে আফগানিস্তানের মাজার শরীফে হত্যা করা হয় বেশ কয়েকজন ইরানী কূটনীতিককে। ওয়াহাবী চিন্তাধারায় প্রভাবিত গ্রুপগুলো এখনও ইরাক ও পাকিস্তানে মুসলমানদের ওপর প্রায়ই সন্ত্রাসী হামলা চালাচ্ছে। (এমনকি বাংলাদেশেও নিরীহ অনেক সুন্নী

মুসলমান উগ্র ওয়াহাবী চিন্তাধারায় প্রভাবিত গ্রুপ জেএমবি'র হামলায় নিহত হয়েছে।-অনুবাদক) ১৯৮০ থেকে ২০০০ সালের ঘটনাবলী এবং ওয়াহাবী মতবাদের পৃষ্ঠপোষক সৌদি সরকারের অর্থনৈতিক সামর্থ্য ও প্রচারণার জোরে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ওয়াহাবী চিন্তাধারা ছড়িয়ে পড়েছে। সহিংসতাকামী মুসলিম গ্রুপগুলোর বিস্তারের পেছনে কেবল এ দু'টি কারণই কাজ করছে বলে মনে করা যায় না। কারণ, অতীতে বর্তমান যুগের সহিংসতার মতো সহিংসতা দেখা যায়নি।

১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার আগের বিবৃতিগুলো পর্যালোচনা করলে এটা বোঝা যাবে যে, আল কায়েদা যতটা ধর্মকেন্দ্রিক দল, তার চেয়েও বাস্তবে বেশি রাজনৈতিক দল। হান্টিংটনের 'সভ্যতার দ্বন্দ্ব' শীর্ষক তত্ত্বের সাথে সুর মিলিয়ে বিন লাদেনও তার যুদ্ধের বৈশিষ্ট্যকে 'মুসলিম জাতিগুলোর বিরুদ্ধে মার্কিন ক্রুসেডের যুদ্ধ' বলে নামকরণ করেন। বিন লাদেন তার যুদ্ধকে যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্র দেশগুলোর সাথে মুসলিম বিশ্বের যুদ্ধ বলে মনে করেন।

বিন লাদেন ১৯৯৬ সালের ২২ আগস্টের এক ঘোষণায় যুক্তরাষ্ট্রকে দুই পবিত্র বা পুণ্যভুমির দেশ দখলকারী বলে অভিহিত করেছেন। তার ঐ 'বিশ্ব-ঘোষণায়' এটাও বলা হয় যে, সৌদি সরকার ইসলামী আইন উপেক্ষা করায় ও মার্কিন ক্রুসেডারদের এই দেশ দখলের সুযোগ দেওয়ায় বৈধতা হারিয়েছে। ১৯৯৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারির এক ফতোয়ায় বিন লাদেন ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে ইসলামী জিহাদ ফ্রন্ট গড়ার ঘোষণা দেন। যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্র দেশগুলো আল্লাহ্, তাঁর নবী ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করায় এসব দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার কথা বলা হয় এ ফতোয়ায়।

আল কায়েদা পাশ্চাত্যকে ধ্বংসের চেষ্টা করছে বলে অনেক গবেষক মনে করেন। কিন্তু কেউ কেউ মনে করেন এ ধারণা ঠিক নয়। অবজারভার পত্রিকার সম্পাদক জে. বুর্ক মনে করেন, পশ্চিমা সভ্যতাকে ধ্বংস করা ইসলামী প্যারামিলিশিয়াদের লক্ষ্য নয়; বরং তারা পাশ্চাত্যকে আগ্রাসী বলে মনে করে এবং পাশ্চাত্যকে আক্রমণাত্মক অবস্থান বা আগ্রাসন থেকে পিছু হটতে বাধ্য করাই তাদের উদ্দেশ্য। তারা আরও মনে করে পাশ্চাত্য তার বিশেষ প্রকল্প বা পরিকল্পনা পরিপূর্ণ করার চেষ্টা করছে যার অংশ ছিল ক্রুসেডের যুদ্ধগুলো ও এরপর উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা। এ প্রকল্পের ফলে মুসলিম বিশ্ব খণ্ড-বিখণ্ড ও অপদস্থ হয়।

বিন লাদেন ১৯৯৫ সাল থেকে ২০০১ সালের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত অর্থশক্তি ব্যবহার করে সারা বিশ্বের সমস্ত র‍্যাডিক্যাল ইসলামপন্থীকে নিজের দলে সমবেত করেন। মিশর, জর্দান, আলজেরিয়া, ইয়েমেন, সুদান, সিরিয়া, এমনকি ইরানের কিছু বালুচকেও নিজ দলের আওতাভুক্ত করেন।

আসলে র‍্যাডিক্যাল সুন্নী ইসলামপন্থীরা পাশ্চাত্যের সোশাল ডারউইনিজ্‌মের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অভিজ্ঞতাবাদ ও ইসলামী বাস্তবতাবাদের প্রয়োগে লিপ্ত হয়েছে। অর্থাৎ তারা হত্যা ও সহিংসতাকে লক্ষ্য হাসিলের প্রথম ও শেষ পন্থা তথা একমাত্র পথ বলে মনে করেন। অন্য কথায় তারা দৃশ্যত পাশ্চাত্যকে নিজের শত্রু বলে মনে করলেও বাস্তবে ম্যাকিয়াভেলীসুলভ পদক্ষেপ নিচ্ছে। তাদের এসব পদক্ষেপ যতটা না বুদ্ধিবৃত্তিক বা মূল্যবোধভিত্তিক তার চেয়েও বেশি আবেগপ্রসূত। আর তাই বিন লাদেনের মত ক্যারিজমাটিক ব্যক্তির প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছে তারা। ইসলামপন্থীদের এ ধারা এ ব্যাপারে অসচেতন যে, তারা আসলে সহিংসতা দূর করার নামে অবাধ সহিংসতাকেই পুরোপুরি অনুমোদন করেছে, যা সম্পূর্ণ স্ববিরোধী ও ভুল।

পশ্চিমা চিন্তাবিদদের মতে ইসলামী মৌলবাদ উদ্ভবের কারণ

এক.

ইসলামী সভ্যতার জন্য দু'টি মৌলিক চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি হয়েছিল দুই দিক থেকে। একটি হল এর অভ্যন্তরীণ অবক্ষয়। আর দ্বিতীয়টি হল গত দুই শতকে মুসলিম বিশ্বে পশ্চিমা আধুনিকতাবাদের সর্বাত্মক হামলা। ইসলামপন্থীরা মনে করে বর্তমান সংকট থেকে মুক্তির একমাত্র পথ হল ইসলামের ঐতিহ্য ও অতীতের দিকে ফিরে যাওয়া। পশ্চিমা চিন্তাবিদদের সমালোচনার কারণে ঘরের ভেতরই পশ্চিমা আধুনিকতাবাদের মধ্যে চিন্তাগত বিভেদ দেখা দিয়েছে এবং জন্ম নিয়েছে পোস্ট মডার্নিজ্‌ম বা উত্তর-আধুনিকতাবাদ। এছাড়াও বিশ্বায়নের ফলে ইসলামকে এর সকল দিকসহ পুনরুজ্জীবিত করার উপযুক্ত সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

জিল কিলের দৃষ্টিতে ইসলাম এক নবীন ও অক্লান্ত শক্তি। এ শক্তি ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় ব্যাখ্যা ব্যবহার করে। তৃতীয় বিশ্বের এক বিশাল অঞ্চলে এ শক্তি সমীহ বা সম্মান পাবার দাবিদার। তাঁর মতে ১১ সেপ্টেম্বরের হামলার ঘটনাকে কেবল রাজনৈতিক ইসলামের উত্থান ও পতনের আলোকে অনুধাবন করা সম্ভব। ব্যবসায়ী ও

পেশাজীবী শ্রেণী, আঘাত পাওয়া শহুরে যুব সমাজ এবং ইসলামপন্থী চিন্তাবিদদের মতো তিনটি স্পর্শকাতর শ্রেণীতে রাজনৈতিক ইসলামের উত্থান ঘটেছে।

বরার্ট ভলটারিংয়ের মতে মুসলিম বিশ্বে মার্কিন সরকার সম্পর্কে খারাপ ধারণার কারণ হল বিশ্বের পরাশক্তি হিসাবে এ সরকার মুসলিম বিশ্বে তার স্বার্থ রক্ষার জন্য দমন-নিপীড়নে অভ্যস্ত সরকারগুলো টিকিয়ে রাখছে।

জার্মান রাজনীতিবিদ উইলি ব্রন্ট ৭০-এর দশকেই এ মত পোষণ করতেন যে, বৈষম্য পৃথিবীকে হুমকিগ্রস্ত করেছে এবং পাশ্চাত্য বিশ্বের একটি নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে সহিংসতা প্রজ্বলিত হয়ে উঠবে। বিখ্যাত জার্মান লেখক গুন্টার গ্রাস বলেছেন, এ সহিংসতা এখন সন্ত্রাসবাদের রূপ নিয়ে আমাদের ওপর চড়াও হয়েছে। পশ্চিমা বিশ্লেষকরা মনে করেন, মধ্যপ্রাচ্যের আরব সমাজে অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধার অভাব, উপযুক্ত শিক্ষা প্রদানের অভাব, গণতন্ত্র না থাকা এবং মধ্যপ্রাচ্য সংক্রান্ত মার্কিন নীতির জনপ্রিয়তা হ্রাস ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার কিছু কারণ।

দুই.

ইরানের ইসলামী বিপ্লব ও শিয়া মাযহাবের রাজনৈতিক ইসলামের নিশান

যুক্তরাষ্ট্রের নিউকনজারভেটিভ বা নব্য-রক্ষণশীলরা মৌলবাদী ধারাগুলোর মধ্যে শিয়াদের ভূমিকাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে। আন্তর্জাতিক ইস্যুগুলোতে বিশেষ অবস্থান নেওয়ার কারণে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান বিশ্বে লাইম লাইটে রয়েছে। শিয়া মাযহাবের অনুসারীরা প্রথমবারের মতো ইরানের ক্ষমতায় আসীন হয়েছিল সাফাভী যুগে। তাদের শাসনামল ছিল ১৫০১ সাল থেকে ১৭৩৬ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত। সাফাভীদের কর্তৃত্ব ইরানের সীমানা ছাড়িয়ে লেবানন ও দক্ষিণ ইরান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অটোমান বা ওসমানীয় তুর্কীদের মাধ্যমে মুসলিম শক্তির ক্ষমতা যখন সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল এবং ওসমানীয় সাম্রাজ্য যখন ইউরোপের নানা অঞ্চল দ্রুত জয় করছিল তখন ব্রিটেন শিয়া-সুন্নী মতবিরোধকে ব্যবহার করে ইরান ও তুরস্কের মধ্যে বিভেদ তথা গোটা মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিভেদ ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা চালায়। এটাই ছিল তৎকালীন ব্রিটেনের প্রধান নীতি এবং বর্তমানেও ব্রিটেন একই উদ্দেশ্যে মধ্যপ্রাচ্যে একটি শিয়া বলয় বা ক্রিসেন্ট গড়ে ওঠার হুমকির কথা প্রচার করছে। দখলদার ইসরাইলের প্রতি মার্কিন সরকারের সহযোগিতার ব্যাপারে মুসলিম

জাতিগুলো সচেতন হয়ে ওঠায় শিয়া-সুন্নী বিভেদ উস্কে দেওয়া সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর জন্য আরও জরুরি হয়ে পড়েছে। কারণ, লেবানন, ইরান ও ইরাকের শিয়া মুসলমানদের মধ্যে গত দুই শতকের সহযোগিতা লক্ষণীয়।

শিয়াদের অভ্যন্তরীণ সুপ্ত ক্ষমতাগুলো ছাড়াও সামাজিক ন্যায়বিচার, ন্যায়পরায়ণ ইমামের শাসন এবং শাহাদাত, ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর অদৃশ্য থাকা, তাঁর আবির্ভাবের জন্য প্রতীক্ষা, নিষ্পাপ নয় এমন সাহাবীদের শাসনকে অবৈধ মনে করা, রাজনীতিতে ধর্মের বিপ্লবী ভূমিকা প্রভৃতি বিষয়ের কারণে রাজনৈতিক ইসলামে তাদের আধিপত্যের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য শিয়া ও সুন্নী মুসলমানদের মধ্যে অভিন্নতা বা ঐক্যের অনেক উপাদান থাকায় লেবানন ও ইরাকের মতো দেশগুলোতে তাদের যৌথ সরকার গঠন সম্ভব হয়েছে। কিন্তু পাশ্চাত্যের বিভেদকামী নীতি ও এ সংক্রান্ত সাজানো কিছু ঘটনা ইসলামী ধারাগুলোর জন্য চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করেছে। জ্বালানি তেলের ওপর কর্তৃত্ব ও ইসরাইলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা মধ্যপ্রাচ্যে ব্রিটেন, ইসরাইল এবং যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত জোটের উদ্দেশ্য। আর এরই প্রতিক্রিয়ায় জেগে উঠেছে মুসলমানরা। মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে এ শক্তিগুলোর উপনিবেশকামী ষড়যন্ত্র সম্পর্কে মুসলমানরা সচেতন হয়ে উঠেছে। হোয়াইট হাউজ ও ইসরাইলের নেতারা মনে করে, পারস্য উপসাগর ও কাস্পিয়ান সাগরের পাশে অবস্থিত ইরানের মতো একটি ইসলামী রাষ্ট্র একবিংশ শতকে পাশ্চাত্যের নানা স্বার্থ, লক্ষ্য ও কৌশলগুলোর জন্য বিপজ্জনক। কারণ, বিশ্বের শতকরা ৬৮ ভাগ জ্বালানি সম্পদ রয়েছে ইরানের ভাণ্ডারে।

মার্কিন সরকার মধ্যপ্রাচ্যের শিয়া জনগোষ্ঠীগুলোর সাথে ইরানের ঘনিষ্ঠতা নিয়ে উদ্বিগ্ন। ইরাকে বাথিস্টদের (বাথপন্থীদের) পতনের পর শিয়া মুসলমানরা এ দেশটির ক্ষমতার প্রধান অংশ বা সিংহভাগ আয়ত্ত করেছে। লেবাননীদের মধ্যে বিভক্তির চেষ্টা সত্ত্বেও হিজবুল্লাহ্ ৩৩ দিনের যুদ্ধে ইসরাইলের মোকাবিলায় বিজয়ী হয়েছে। এসব বিষয় ইসরাইল ও যুক্তরাষ্ট্রের দুঃশ্চিন্তা বাড়িয়ে দিয়েছে।

পশ্চিমা রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করেন শিয়া আলেমদের নেতৃত্বে শিয়ারা সব সময়ই রাজনীতির ময়দানে সক্রিয়। এ কারণে তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে মার্কিন বিরোধী। শিয়াদের আদর্শিক কাঠামো বিশেষ দেশ ও সীমারেখার বাইরেও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বিস্তৃত। এজন্য ইসলামী ইরান বিশ্বের যে কোন দেশের শিয়া দলগুলোর ওপর গভীর প্রভাব রাখে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক সম্পর্ক পরিষদের প্রধান জার্মান ম্যাগাজিন

স্পিগ্যালকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, ইরান এ অঞ্চলের একটি শক্তিশালী দেশে ও একটি ক্লাসিক রাজকীয় শক্তিতে পরিণত হবে এবং ইসলাম এ অঞ্চলের রাজনৈতিক ও চিন্তাগত শূন্যতা পূরণ করবে। তিনি আরও বলেন, ইরানের ব্যাপারে মার্কিন নীতিতে পরিবর্তন ঘটানোর সময় এসেছে।

মার্কিন কর্মকর্তারা এটাও বলছেন যে, ইরানের ইসলামী বিপ্লব রপ্তানি প্রতিরোধের কোন নিশ্চয়তা নেই। ইরানের নেতারা ইসরাইলের বিরুদ্ধে লেবাননের হিজবুল্লাহ্সহ এ অঞ্চলের শিয়াদের সহায়তা করছে। ইরানের পারমাণবিক ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রের নীতি নির্ধারকদের দুঃশ্চিন্তা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। ইরাকের শিয়াদের সাথে ইরানের শিয়াদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকায় দেশটির ওপর ইরানের ব্যাপক প্রভাব থাকবে এবং আদর্শিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্যের কারণে পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের অন্যান্য শিয়া গ্রুপ ও জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে কুয়েত, বাহরাইন, ও তেলসমৃদ্ধ সৌদি আরবের শিয়ারা শক্তিশালী হবে। মধ্যপ্রাচ্যে শিয়াদের ক্ষমতা জোরদার হওয়ায় ওয়াহাবীরা আতংকিত হয়ে পড়েছে।

কোন কোন মার্কিন জেনারেল মনে করেন, শিয়া অধ্যুষিত ইরান, ইরাক ও লেবানন ছাড়াও সিরিয়া, ফিলিস্তিন এবং সৌদি আরবের শিয়া অধ্যুষিত অঞ্চলে গণতন্ত্রের ক্রিসেন্ট গড়ে ওঠা এমন এক বড় ঝুঁকি যার পরিণতি আঁচ করা সম্ভব নয়। এসব অঞ্চলে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে শিয়াদের জন্য সক্রিয় ভূমিকা রাখার পথ খুলে যাবে। সৌদি আরব ও বাহরাইনের পৌরসভার নির্বাচনের ফলাফলই এর প্রমাণ।

শিয়া রাজনৈতিক ইসলামের বিপ্লবী, আদর্শিক ও ধর্মীয় বিশ্বাসগত নানা শক্তি ছাড়াও রয়েছে ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব। ফলে এ ইসলাম পাশ্চাত্যের জন্য মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলে চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করেছে। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ঘটনা এবং নীতিতে প্রভাব রাখছে শিয়ারা। জ্বালানি তেলক্ষেত্রও গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক হয়ে পড়েছে। গ্রাহাম ফুলারের মতো লেখক 'বিস্মৃত আরব শিয়া মুসলমান' শীর্ষক বইয়ে শিয়াদের কৌশলগত ও ভৌগোলিক অবস্থান তুলে ধরে বলেছেন, জ্বালানি স্বার্থসহ দীর্ঘ মেয়াদী নানা স্বার্থ রক্ষার জন্য মার্কিন সরকারের উচিত শিয়াদের সাথে সংলাপে বসা।

অনুবাদ : জাহান বিন

[তেহরান থেকে প্রকাশিত ম্যাগাজিন 'উলুমে সিয়াসি' (রাজনীতি বিজ্ঞান), ১০ম বর্ষ, ৩৯-৪০তম সংখ্যা থেকে অনূদিত]